দাম : ষোলো টাকা

ভারতের মহাকাশ
গবেষণাকে পিছিয়ে দেবার
পিছনে কি হামিদ আনসারি ?
— পৃঃ ১৬

স্বস্তিকা

সিংহ অহিংস হলে
আর সিংহ থাকে না
— পৃঃ ২৩

৭৪ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ১ আগস্ট, ২০২২।। ১৫ শ্রাবণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

নতুন সংসদ
ভবনের মাথায়
জাতীয় প্রতীক
অশোকস্তম্ভের সিংহ
নিয়ে শুরু হয়েছে
বিতর্ক। এই বিতর্কের
সারবত্তা নিয়েই
উঠছে প্রশ্ন।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১ আগস্ট - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বাঙ্গলায় সকলে চিৎকার করে বলছে 'চোর চোর চোর'
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

আলকাতরা হইতে সাবধান! □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

চব্বিশের নির্বাচন মোদী বিরোধীদের কাছে বিপদ সংকেত
□ নলিন মেহেতা □ ৮

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত □ বিশ্বামিত্র □ ১০

আপনি জয়ী হোন দ্রৌপদী □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১১

তিস্তা সেতলওয়াড়ের ছকে সোনিয়ার হাত
□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১৩

ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে পিছিয়ে দেবার পিছনে কি হামিদ আনসারি □ সুমন চন্দ্র দাস □ ১৬

সিংহ অহিংস হলে আর সিংহ থাকে না
□ অনঙ্গদেব মিত্র □ ২৩

সিংহনাদে অবস্থান স্পষ্ট করছে নতুন ভারত
□ নিখিল চিত্রকর □ ২৬

ছবি কথা বলে □ শীতাংশু গুহ □ ২৮

আদর্শ রানি—ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাই হোলকার
□ পৃথ্বীশ সেন □ ৩১

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর এক আন্তর্জাতিক মহামানব
□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৪

২০৪৭-এর লক্ষ্যে কোমর বাঁধছে ওরা
□ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ৩৫

স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে ইসলামিক দেশ বানানোর ছক
□ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ৩৭

বাংলাদেশে ইসলামি সন্ত্রাস চলছেই
□ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ৪৩

বসুন্ধরাকে এখনই না বাঁচালে অনেক দেরি হয়ে যাবে
□ অরবিন্দ ব্যানার্জি □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩০ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ৮ আগষ্ট ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৮ আগষ্ট ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পার্থর অনর্থ

রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে একুশ কোটিরও বেশি নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। সঙ্গে রয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না, রাশি রাশি বিদেশি মুদ্রা। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে পার্থ ও অর্পিতাকে। পার্থর আরেক ঘনিষ্ঠ মোনালিসা দাসের শান্তিনিকেতনে দশটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে ওঠাও আপাতত ইডি-র স্ক্যানারে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিপুল দুর্নীতির বিশ্লেষণ। লিখবেন বিমলশঙ্কর নন্দ, ভবানী শঙ্কর বাগচী প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০্ টাকা।

ডাকযোগে বইটি নিতে হলে ডাক খরচ বাবদ ৫০্ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।

প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২। জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০্ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**
A/C. No. : **0954000100121397**
IFS Code : **PUNB0095400**
Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**
VIVEKANAND ROAD
Kolkata - 700 006

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জাগ্রত সিংহ, জাগ্রত ভারত

ভারতের নূতন সংসদ ভবনের জন্য নির্মিত অশোক স্তম্ভের সিংহ লইয়া দেশের রাজনৈতিক বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সমালোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই সিংহগুলি সারনাথের প্রকৃত সিংহ নহে। অশোক স্তম্ভের সিংহ এইভাবে নির্মাণ করিয়া নাকি ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের অবমাননা করা হইয়াছে। বিরোধিতায় শামিল হইয়াছেন মিমের আসাদুদ্দিন ওয়েইসি, কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র। তাহাদের চক্ষে নাকি পুরাতন অশোক স্তম্ভের ন্যায় নূতন অশোক স্তম্ভের সিংহগুলি 'সুন্দর ও প্রশান্ত নয়। নূতন সিংহগুলি বিরক্তিকর, অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।' আসলে রাজনৈতিক বিরোধীরা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করিবার আর কোনো ইস্যু না থাকিবার কারণে চিন্তাভাবনা না করিয়াই এইভাবে সমালোচনা করিতেছেন। ইহাতে তাহাদের চিন্তার দৈন্যই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। ইহা শুধু বিরোধিতা করিবার জন্যই বিরোধিতা। নূতন অশোক স্তম্ভের শিল্পী সুনীল দেউড়ে বলিয়াছেন, নবনির্মিত অশোকস্তম্ভটি সারনাথের অশোক স্তম্ভেরই একটি বর্ধিত সংস্করণ মাত্র, ইহাতে কোনোরূপ সংযোজন করা হয় নাই। পূর্বেকার স্তম্ভটি ১.৬ মিটার লম্বা। নূতন স্তম্ভটি ৬.৫ মিটার লম্বা। যদি আগের স্তম্ভের আকার বর্ধিত করা হয় অথবা নূতন স্তম্ভের আকার ছোটো করা হয়, তাহা হইলেই বিবাদভঞ্জন হইবে। ইহা শুধুমাত্র অনুপাত ও দৃষ্টিকোণের বিষয়। সংসদ ভবনের উপরিস্থিত অশোকস্তম্ভ যাহাতে একশত মিটার দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহার জন্যই বর্ধিত আকারের করা হইয়াছে।

আসলে রাজনৈতিক বিরোধীরা ক্ষুদ্র অশোক স্তম্ভের সিংহগুলিকে এতদিন যাবৎ শিশুসিংহ ভাবিয়া আসিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে তাহারা সিংহত্ব দেখিতে পান নাই। বিগত সত্তর বৎসর ধরিয়া তাহারা রাষ্ট্রীয় প্রতীকের সিংহগুলিকে মেষ ভাবিয়া তদ্রূপ দৃষ্টিভঙ্গিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছেন। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে দেশ সিংহবিক্রমে জাগ্রত হইয়াছে, ইহা তাহারা মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। তাহারা জানিতেনই না যে অশোক স্তম্ভের চারটি সিংহ— শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস ও গৌরবের প্রতীক। একদা ভারত সম্রাট অশোক বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নৃপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রতীক রূপে সিংহের ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি তথাগত বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। তথাগত বুদ্ধকে শাক্যসিংহও বলা হইত। মোদী বিরোধীরা পরিণত ও জাগ্রত সিংহকে মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। জাগ্রত সিংহ অর্থাৎ জাগ্রত ভারত। এই ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দান করিতেছে। এই ভারত প্রাণবন্ত, শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করিতে জানে। এই ভারত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মজবুত। গত সত্তর বৎসর ধরিয়া যে ভারত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই ভারত আজ ব্যাপক হারে তাহা রপ্তানি করিতেছে। বর্তমান ভারত-সিংহের নিকট রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কোনো রাজনীতির বিষয় নহে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কঠিন ও কঠোর। বর্তমান ভারত শত্রুর চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিতে পারে। বর্তমান ভারতের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নীতি হইল 'নেশন ফার্স্ট'। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে বর্তমান ভারতের অঙ্গীকার হইল দেশ কীভাবে আরও শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। নবনির্মিত অশোক স্তম্ভের সিংহের প্রাইডে রাজনৈতিক বিরোধীরা শঙ্কিত, ভীত। তাঁহারা অস্তিত্বহীনতায় ভুগিতেছেন। তাই তাঁহারা আর কোনো পথ না পাইয়া অযথা সমালোচনায় মাতিয়াছেন।

সুভাষিতম্

অল্পায়াং বা মহত্যাং বা সেনায়ামিতি নিশ্চয়ঃ।

হর্ষো যোধগণস্যৈকো জয়লক্ষণমুচ্যতে।।

সৈন্যদল ছোটো হোক বা বড়ো, প্রত্যেক সৈনিকের মনে লড়াই করার উৎসাহই জয় লাভ করার মুখ্য লক্ষণ।

বাঙ্গলায় সকলে চিৎকার করে বলছে ‘চোর চোর চোর’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আজ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে চোর-ডাকাতের পদধ্বনি। লোভী হায়নাদের আনাগোনা। ঘটেছে রাজ্যের দুর্বৃত্তায়ন। আলিবাবা আর চল্লিশ চোরের কাহিনি সবাই জানেন। শেয়ার বাজারের দালাল হর্ষদ মেহতার টাকাভর্তি ব্রিফকেস প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা হয়তো অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের পুণ্য বঙ্গভূমিতে আজ চোর, লুঠেরা আর দুর্বৃত্তদের পদধ্বনি। ‘বাঙ্গলার বিপর্যয়’ বোঝাতে গানের লাইনটি ধার করলাম। রচয়িতা এখন নিজেই চক্রব্যূহে। হাড়ে-মজ্জায় বুঝছেন তাঁর সৃষ্টি কীভাবে বুমেরাং হচ্ছে। ঠাট্টা করে বলা হয় ‘চুরি ধর্ম বড়ো ধর্ম, যদি না পড়ে ধরা’। এটা সত্য যে আদালতে দোষী প্রমাণ না হলে কেউ চোর বা অপরাধী নন। কিন্তু জনতার আদালতে কলঙ্কের দাগ থেকে যায়। একটি বিখ্যাত হিন্দি ছবিতে ছোটো ছেলের হাতে লিখে দেওয়া হয়েছিল ‘তেরা বাপ চোর হ্যায়’। মৃত্যু পর্যন্ত সেই কলঙ্ক সে মুছতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর ডাকনাম ‘কাতু’। কাতুবাবু খানিকটা কাত হয়ে পড়েছেন। অর্থনৈতিক, বেআইনি আর অশ্লীল বিষয়ে তাঁর নাম জড়িয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ‘অপরাধমূলক চক্রান্ত’(১২০বি) আর ‘প্রতারণা বা ঠকানোর মাধ্যমে অসৎভাবে সম্পত্তি বিতরণের’ (৪২০) অভিযোগ এনেছে তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি। তার সঙ্গে বেআইনি হাওলা টাকার যোগ রয়েছে। অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তিনি দুর্নীতিতে জড়িয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বমাল গ্রেপ্তার হয়েছেন। দলের মহাসচিব পার্থবাবু। দল আপাতত হাত ধুয়ে ফেলেছে। দুই সুপ্রিম কমান্ডার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বোবা হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে এড়িয়ে চলছেন। দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি থেকে আগেই পার্থবাবুকে সরিয়ে সুব্রত বক্সিকে বসিয়ে দেন মমতা। তাঁর গ্রেপ্তারের ৪৮ ঘণ্টা আগে মমতা আর অভিষেক দলের মধ্যে বেআইনি টাকার লেন-দেনের বিরুদ্ধে হুমকি দেন।

কাকে নিশানা করেছিলেন তাঁরা? পরামর্শদাতা আইপ্যাকের সহায়তা নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বৃদ্ধতন্ত্র ভাঙতে উদ্যোগী হয়েছিলেন অভিষেক। চরম বিরোধিতা করেছিলেন পার্থবাবু-সহ আরও ছয় নেতা। এখন দলের জাতীয় কমিটি-র ২০ জনের মধ্যে ৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। গত এপ্রিল মাস থেকে পার্থবাবুর পিছু নিয়েছে সিবিআই। দু’বার জেরা করা হয়েছে।

পার্থবাবু কেবল দুর্নীতির মুখোশ, তাহলে মুখটা কার? পার্থ কি পারবেন তাকে আড়াল করতে?

তৃণমূলের নেতা বা মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার নতুন কিছু নয়। ওদের গা সয়ে গিয়েছে। ২০১৪-র সারদা চিটফান্ড আর ২০১৭-র নারদা ঘুষ মামলার কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। তদন্তকারীদের মনে রাখা দরকার যে তাঁরা আদালতের কাছে দায়বদ্ধ। কানাঘুষো চলছে পার্থবাবুর পর তালিকায় রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল (কেষ্ট) এবং আরও কয়েকজন। বেআইনি কয়লা আর গোরুপাচারের ফার্স্ট লিস্টে নাকি তদের নাম ঝুলে রয়েছে। আর বিজেপির দাবি, লাইনের শেষ মাথায় রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মলয়বাবু ইতিমধ্যেই ইডি-র চারটি জেরা এড়িয়েছেন। ‘কেষ্টবাবুর দু’বার জেরা হয়েছে।

অভিষেক গভীর জলের মাছ। ১৭ ঘণ্টা জেরা করেও ইডি তাঁকে বাগে আনতে পারেনি। ইডিকে ১১৫২ পাতার জবাব পাঠিয়েছেন অভিষেক। বিরোধীরা আহ্লাদিত যে জাল গোটাচ্ছে ইডি আর সিবিআই। এই মুহূর্তে তৃণমূল পাঁকে আর মমতা ও অভিষেক বিপাকে। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে পিঠ বাঁচাতে মুকুল রায়ের মতো পার্থবাবুও বিজেপির রাস্তা ধরবেন। অন্যায়কে আড়াল করতে বিজেপিতে যাওয়ার এই আজগুবি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল। তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলেন, ‘ সে যাই হোক পার্থর রাজনৈতিক কেরিয়ার ফিনিশ। বুঝতে পারেনি কাচের ঘরে থেকে অন্যের ঘরে ঢিল ছুড়তে নেই।’ যদি ধরেই নিই, পার্থবাবু কেবল দুর্নীতির মুখোশ, তাহলে মুখটা কার? পার্থ কি পারবেন তাকে আড়াল করতে? পাপ কখনোও বাপকে ছাড়ে না। আর কাক কাকের মাংস খায় না। তবে পার্থবাবুর ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হতে পারে।

□

আলকাতরা হইতে সাবধান!

পরমাত্মীয়েষু দিদিভাই,

এ কী ফ্যাসাদ বলুন তো! বান্ধবীকে নিয়ে ফুর্তি, টাকা নিয়ে কীর্তি আর অ্যারেস্ট মেমোতে কিনা আপনার নাম। এর কোনও মানে আছে! পার্থ অতি সুবোধ বালক যে নয় তা আপনি জানেন। তাই আপনি ভালোই বুঝছেন যে, এ সবই ভেবেচিন্তে করা। আপনার নামে কালি লাগানোর চেষ্টা। আপনি অবশ্য বলে রেখেছেন আপনার হাতে আলকাতরা আছে। কিন্তু বিজেপির গায়ে সেই আলকাতরা লাগানোর আগে পার্থর ভুড়িতেও লাগাবেন নাকি!

খবরে যা পড়লাম তাতে ২২ জুলাই, শুক্রবার ঘড়ির কাঁটায় তখন রাজ দেড়টা। নাকতলার বাড়ির দোতলার ঘরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে বসে ইডি-র তদন্তকারীরা। নিয়মমাফিক পার্থকে জানানো হয়, গ্রেপ্তারের প্রাক-মুহূর্তে কোনও এক নিকটাত্মীয়কে ফোন করে ঘটনাটি জানাতে হবে। পার্থ জানান, স্ত্রী প্রয়াত। মেয়ে বিদেশে। ফোনে পাওয়া মুশকিল। দাদা আছেন। কিন্তু অত রাতে তাঁর ঘুম ভাঙানো মুশকিল। তবে? পার্থ তখন সরাসরি আপনার নাম করেন। অবাক হয়ে ইডি অফিসারেরা জানতে চান, 'আপনি কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছেন?' পার্থ মাথা নাড়াতে ইডি-র কর্তা প্রশ্ন করেন, 'এখন গভীর রাত। অনারেবল সিএম কি এখন আপনার ফোন ধরবেন?' জবাবে পার্থ বলেন, 'যত রাতই হোক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ফোন ধরবেন।' পার্থ জানান, মমতা তাঁর 'পরমাত্মীয়'।

ন্যাকা। পরমাত্মীয় না ছাই! অতই যদি কাছের ভাবে তবে এতগুলো বান্ধবীর কথা তো বলেনি! বান্ধবীর বাড়িতে লুকিয়ে কোটি কোটি টাকা জমানোর কথা তো বলেনি! তখন তো ভাবতে পারত আমার একজন পরমাত্মীয় আছেন। এখানে সেখানে বান্ধবী বানিয়ে রেখেছে, তাঁদের জন্য ফ্ল্যাট, বাড়ি, গাড়ি সব করেছে তখন তো পরমাত্মীয়র কথা মনে পড়েনি। কীসের জোরে করে খেয়েছিস হ্যাঁ? তোকে মন্ত্রী না করলে, কে ওই ১৩০ কেজির বডি দেখে প্রেমে পড়ত? কে তোকে এত এত টাকা দিত? সেই সময়

> আপনি যতই দামি চটি পরুন আসলে তো সেটা হাওয়াই। আপনি যতই দামি পোশাক পরুন আসলে তো তাঁত। সেই সততার ইমেজে গ্যামাক্সিন ছড়ানোর চেষ্টা সহ্য করা যাবে না।

মনে নেই। এখন পরমাত্মীয় বলে ফাঁসানোর চেষ্টা! হ্যাঁ, দিদি আমার এটাই মনে হচ্ছে। কেন আপনার নাম জড়ানো হবে বলুন তো!

সেই যে আপনি যখন পার্থর পুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন তখন অর্পিতা না কে ওই মেয়েটা চুপটি করে বসে ছিল। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। কী দরকার ছিল আপনার সঙ্গে মঞ্চে বান্ধবীকে রাখার। আপনাকে দিয়ে প্রশংসা করানোরই-বা কী দরকর ছিল! হয় তো তখন থেকেই ছক কষে রেখেছিল, একটা প্রমাণ রেখে দিই যে দিদির সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। এখন তো ক্লাবেরই কেউ সেই ভিডিয়োটা তুলে দিয়েছে বিজেপির হাতে। আপনাকে সহজ, সরল পেয়ে আপনার সততা নামের সার্টিফিকেটটায় কালি লাগাতে চাইছে। যেমন করে আপনার দলের লোকেরাই একসময়ে আপনার পিএইচডি সার্টিফিকেটে কালি লাগিয়েছে। সব চক্রান্ত দিদি, সব চক্রান্ত।

আপনি রেগেমেগে অনেক কথাই বলেছেন। ঠিকই করেছেন। সবাই যা খুশি করবে নাকি! আপনার একটা ইমেজ আছে তো নাকি! ত্যাগের ইমেজ। আপনি যতই দামি চটি পরুন আসলে তো সেটা হাওয়াই। আপনি যতই দামি পোশাক পরুন আসলে তো তাঁত। সেই সততার ইমেজে গ্যামাক্সিন ছড়ানোর চেষ্টা সহ্য করা যাবে না। তাই আপনার গলায় গলা মিলিয়ে আমিও বলছি, 'বিজেপি-সিপিএম টাকার পাহাড় দিয়ে দিদির ছবি দিচ্ছে কলকাতা জুড়ে! রাজনীতি না করলে দিদি জিভটা কেটে দিতে পারতেন!'

'যে অন্যায় করেছে, তার বিরুদ্ধে যা খুশি করুন। দিদিকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবেন না! যদি কেউ চোর-ডাকাত হয়, দিদি তাকে ছেড়ে কথা বলেন না। কিন্তু অযথা দিদির গায়ে কালি ছেটালে মনে রাখবেন, আলকাতরা কিন্তু দিদির কাছেও আছে। দিদি আলকাতরা মাখালে সেটা কিন্তু কোনও ওয়াশিং মেশিনে ধুলেও উঠবে না।'

আপনার সঙ্গে গলা মেলাতে আমার হেব্বি লাগে। তাই বলে আপনি আবার কোনওদিন আমায় পরমাত্মীয় ডেকে ফাঁসাবেন না কিন্তু। দোহাই দিদি।

অতিথি কলম

নলিন মেহেতা

চব্বিশের নির্বাচন মোদী বিরোধীদের কাছে বিপদ সংকেত

২০২৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলগুলি বিজেপির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তাদের রাজনীতিতে কৌশলগত বড়ো পরিবর্তন আনতে পারবে কি? এ বিষয়ে বিজেপি বিরোধী দলগুলির সহজ সমীকরণ সদা প্রস্তুত থাকে। সেটা হলো তারা সকলে মিলে একজোট হলেই অনায়াসেই বিজেপির অগ্রগতিকে রুখে দিতে পারে। এই ধরনের জোট বিজেপি বিরোধিতা সূত্রে যে একধরনের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম দেয় বিজেপির একাধিপত্য খর্ব করতে তাই যথেষ্ট। তাঁরা অঙ্ক কষে দেখান এবং যা অঙ্কের নিয়মে ভুল কিছু নয় যে ২০১৯ সালে সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করে লোকসভা নির্বাচন জেতার সময়ও বিজেপি সমগ্র ভোটদাতাদের মধ্যে ৩৭.৩৬ শতাংশের সমর্থন পেয়েছিল। শতাংশের হিসেবে এই ভোট মোট ভোটারের এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশি। তাহলে বাকি দুই তৃতীয়াংশের ভোটকে যদি এক ছাতায় আনা যায় তাহলেই মোদীর উত্থান অনায়াসে রুখে দেওয়া যাবে। আপাতভাবে খুবই সরল অঙ্ক। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করল এই ধরনের হিসেব নিকেশ বা বিশ্লেষণ কতটা অসার ও অর্থহীন।

দেখা গেল ভোট দেওয়ার সময় বহু রাজ্যভিত্তিক দল বিরোধীদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে এনডিএ-র রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকেই বেছে নিয়েছেন। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল কেবলমাত্র অন্ধ মোদী বিরোধিতা কোনো বিরোধী ঐক্য তৈরি করার রসায়ন হিসেবে যথেষ্ট নয়। তথ্যে উঠে এসেছে ছোটো বড়ো মিলিয়ে ৫০টি রাজনৈতিক দল শ্রীমতী মুর্মুকে সমর্থন করেছে। এর বিপরীতে ৩৬টি দল বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণ ভবে শেষমেশ যারা শ্রীমতী মুর্মুর পক্ষে সমর্থন দিল তাদের মধ্যে বহু এনডিএ জোটের বাইরের দল ছিল। ওড়িশার বড়ো দল বিজেডি, অন্ধ্রের YSRCP, মায়াবতীর বহুজন সমাজ, ঝাড়খণ্ডের শাসকদল জেএমএম এমনকী মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের দিকে থাকা শিবসেনার অংশও বাদ যায়নি।

একজন জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাকে প্রার্থী করে বিজেপি যে আদর্শ কৌশল নিয়েছিল তার ভিত্তিতে অন্যান্য বহু দলই জনতার নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ে এই ধরনের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রার্থীর বিরোধিতা করার সাহস জোটাতে পারেনি। শাসক দলের ক্রমাগত বদলে যাওয়া রাজনৈতিক চরিত্র এবং প্রান্তিক জনজাতিদের প্রতি একেবারে সুনিশ্চিত সংকেত পাঠানো যে তারা রাজনৈতিক ভাবে সর্বোচ্চ পদে যাওয়ার অধিকারী বিরোধী অনুমান একেবারে তছনছ করে দেয়। হিন্দুত্বের বা তথাকথিত বিজেপি বিরোধিতা মুখ থুবড়ে পড়ে।

মোদীর উত্থানের সঙ্গে যুগপৎ আঞ্চলিক দলগুলির মূল কাঠামো (জাতপাত তস্য তস্য মন্ত্রে উপজাতি, মহাদলিত ইত্যাদি) ধ্বসে যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতের মহাজোটের পথ যথেষ্ট কণ্টাকাকীর্ণ।

২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রে আসার পর থেকেই রাজ্য ভিত্তিক দলগুলি দেশের রাজনীতির ধাঁচায় যে পরিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হিমসিম খাচ্ছে। জাতপাতের রাজনীতির পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এই নতুন রাজনৈতিক পরিসরে ২০২৪-এর নির্বাচনের লড়াই এদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এমন চার ধরনের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।

(১) বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস দু' দলের সোজাসুজি লড়াই। এই লড়াই সেই রাজ্যগুলিতেই সরাসরি হয় যেখানে কংগ্রেস ও বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। অন্য কোনো শক্তিশালী দলের এখানে প্রভাব নেই। যেমন গুজরাট, রাজস্থান, হিমাচল, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি বা কর্ণাটক। সাম্প্রতিক কয়েকবছর মণিপুর ও ত্রিপুরা এই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে হয় কংগ্রেস বা বিজেপি দু'জলের একদল ক্ষমতাসীন হয়। মোটামুটি ভাবে এটাই দেখা যেত।

প্রথম ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর

উত্থানের পর থেকে এই দ্বিপাক্ষিক ক্ষমতা বদলের তত্ত্বেও গরমিল হতে থাকে। এটি প্রধানত লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রকট হয়ে ওঠে। ২০১৪ ও ১৯-এর নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্যগুলিতে বিপুল সংখ্যক আসন পাওয়া শুধু নয়, দলের ভোট শতাংশও নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়।

এখন এর থেকে সারাংশ করলে দাঁড়ায় যে কংগ্রেস ভীষণ ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এরই পরিণতিতে কোনো বিরোধী জোটের নির্ণায়ক ভূমিকায় অধিষ্ঠান করার যোগ্যতা তার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও দিল্লি বা পঞ্জাবের মতো রাজ্যের নির্বাচনে আপ-এর মতো দল ক্ষমতা দখল করছে। দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস ও আপ পরস্পর একই উদ্দেশ্যে পরস্পর লড়ছে।

(২) বিজেপি ও অন্যান্য রাজ্যস্তরের দলগুলি— এই তালিকায় আসছে অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা যেখানে কংগ্রেসকে সরিয়ে মূল বিরোধী দলে জায়গায় এসেছে বিজেপি। ওড়িশাতে ২০১৪ সালে লোকসভায় ১টি আসন ও (২১.৫ শতাংশ ভোট) ২০১৯ সালে ৮টি আসন (২৮.৪ শতাংশ ভোট) পায় বিজেপি। যদিও বিধানসভা নির্বাচনে বড়ো জয় পায় নবীন পট্টনায়কের বিজেডি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও ২০১৯ সালের লোকসভা ও ২০২১ সালের বিধানসভায় একই ধরনের ফলাফল হয়। লোকসভায় হড্ডাহাড্ডি বিধানসভায় বড়ো পরাজয়। ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানায় বিজেপি কংগ্রেসকে স্থানচ্যুত করে তেলেঙ্গায় রাষ্ট্রীয় দলের মুখ্য বিরোধী হয়ে ওঠে। ২০২০ সালের হায়দরাবাদ পৌর নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে। ২০১৯-এর লোকসভায় চারটি আসন দখল করে। এর মধ্যে টিআরএস-এর অত্যন্ত শক্ত ঘাটি করিমনগর ও নিজস্ব বাদের আসনও রয়েছে। এর পর থেকেই দেখা গেল প্রাদেশিক দলগুলি রাজ্যে বিজেপির আগ্রাসন থেকে তাদের স্থানীয় গড় রক্ষা করতেই তৎপর। সকলেই হয়তো চাইছে একটি দুর্বল বিজেপি। কিন্তু বাস্তবে নিদেনপক্ষে নিজের ঘর বাঁচাতে কেন্দ্রীয় স্তরে দিল্লিতে বোঝাপড়া করে আসছে।

(৩) প্রাদেশিক দলের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক দল— সকলেই জানেন তামিলনাড়ু ও কেরলে বিজেপি কখনই বড়ো শক্তি নয়। সে কারণে সর্বভারতীয় নির্বাচনেও বিজেপি কিছুটা প্রান্তিক হলেও বিজেপি ধীরে ধীরে কিছু কিছু সবুজ চারাগাছ দেখতে পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর তামিলনাড়ুতে তাদের ভোটার সংখ্যা বাড়ছে। কেরলের রাজধানী শহর তিরুবনন্তপুরমে ৩১ এবং পতনমতিট্টা ও ত্রিসূরে তারা ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। দাক্ষিণাত্যের এই দুই রাজ্যের নির্যাস হলো তামিলনাড়ুতে AIADMK কিছুটা ছন্নছাড়া অবস্থায় আর কেরলে কংগ্রেস সমর্থন ক্রমশ নিম্নগামী। এখানে বিজেপি শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করছে। স্থানীয় পরিস্থিতি, মানুষের বিশেষ ধরনের প্রত্যাশার ওপর আলাদা নীতি গ্রহণ করছে দল যা উত্তর ভারতের থেকে ভিন্ন গোত্রের।

(৪) বহু দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বিজেপির আধিপত্য— এই আওতার মধ্যে আসবে সেই সমস্ত রাজ্যগুলি যেখানে বেশ কিছু দল নির্বাচনী ময়দানে থাকে তাদের মধ্যে থেকে বিজেপি মুখ্য শক্তি হিসেবে বেরিয়ে আসে। যেমন, উত্তরপ্রদেশ, অসম, উত্তর-পূর্বের ছোটো রাজ্যগুলি, ঝাড়খণ্ড এমনকী মহারাষ্ট্রও কিছুটা এই বৃত্তের মধ্যে এসে পড়ে। সর্বশেষ নির্বাচনী পরিস্থিতি অনুযায়ী বিজেপির অগ্রগতি আঞ্চলিক দলগুলিকে ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে লালিত বাঁধা ভোটব্যাংকের যে কৌশল নিয়ে চলত তা ধরে রাখতে এমন মরণপণ চেষ্টা করছে। অতীতে বিজেপির নিজস্ব আদর্শই দলের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াও। হিন্দুত্বের তত্ত্ব আজ দলের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। মানুষ তা ক্রমশ গ্রহণ করেছে। অবশ্যই দাক্ষিণাত্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে দল এখনও তেমন দাগ কাটতে পারেনি। তবে এর মধ্যে তেলেঙ্গানায় বিজেপি বর্তমানে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে। বিজেপিই এমন যেখানে anti establishment মুখ যাকে ঘিরে বহু রাজনীতিবিদ যাঁরা ক্ষমতার সোপানে চড়তে চান তারা জড়ো হচ্ছেন। ভূতপূর্ব টিআরএস নেতা এতালা রাজেন্দর ২০২১ সালে দলের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে এসে উপনির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জিতেছেন। এর থেকেই তেলেঙ্গানা রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ বোঝা যাচ্ছে।

উপসংহার টেনে বলা যায়, অতীতের সমস্ত মহাজোটের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী দল মধ্যমণির ভূমিকা নিত। যেমন কংগ্রেস বা কোনো ব্যাপক গ্রহণযোগ্য নেতার দল যেমন তৎকালীন হরকিষেন সিংহ সুরজিতের বহু আঞ্চলিক দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতা একত্রিত হতে সুবিধে দিয়েছে। এগুলি সবই ১৯৯০-এর দশকের ঘটনা। দশকের শেষ থেকেই কংগ্রেসের ক্ষয় শুরু হতে থাকে। একই সঙ্গে ২০১৪-তে মোদীর উত্থানের সঙ্গে যুগপৎ আঞ্চলিক দলগুলির মূল কাঠামো (জাতপাত তস্য তস্য মন্ত্রে উপজাতি, মহাদলিত ইত্যাদি) ধ্বসে যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতের মহাজোটের পথ যথেষ্ট কণ্টাকাকীর্ণ। ২০২৪ তাই মোদী বিরোধীদের কাছে বাস্তবিকই বিপদ সংকেত। ***(লেখক বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক)***

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলা সহ-সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী গত ২২ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। একই দিনে তাঁর সহধর্মিণী সাথী চট্টোপাধ্যায় (৫৮) হৃদয়াঘাতে পরলোকগমন করেন। তিনি ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অধুনা কলকাতা নিবাসী ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কার্যকর্তা নীহারেন্দু দত্তের বড়ো পুত্র নীলোৎপল দত্ত মুম্বাইয়ে চিকিৎসাধীন ছিল। এয়ারবাসে কলকাতায় আসার পথে গত ২৫ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

* * *

মালদা জেলার কালিয়াচক খণ্ডের রানাপ্রতাপ শাখার স্বয়ংসেবক প্রকাশ দাসের মা নিয়তি দাস গত ১৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

গত ২৪ জুলাই 'সেভ এডুকেশন' নামক এক ফোরামের একটি অনলাইন অনুষ্ঠানে 'জাতীয় শিক্ষানীতি'র বিরোধিতা করতে গিয়ে ইরফান হাবিব ভারত সরকারের 'ইতিহাস বিকৃতি'র তীব্র সমালোচনা করেছেন। এতদিন যে 'ইতিহাস বিকৃতি'-তে তাঁর মতো ইতিহাসবিদদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এখন তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার এহেন মরিয়া চেষ্টা দেখে ইতিহাস-সরস্বতী নিশ্চয়ই মুচকি হাসছেন। 'সেভ এডুকেশন' ফোরামের কথায় পরে আসা যাবে, আগে হাবিবের ক্ষোভের মূল কারণটা দেখে নেওয়া যাক। তিনি ওই অনুষ্ঠানে বলেছেন, ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে কোনোরকম আপোশ করা চলবে না। বিষয়টির উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন, আকবর উদারমতি সম্রাট ছিলেন। কিন্তু বর্তমান শাসকরা নাকি তাঁর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, মুঘল শাসনে ভারতবর্ষের এতদূর ক্ষতি হয়েছে, তাতে শুধু মুঘল সম্রাট আকবর কেন, বাকি মুঘল সম্রাটদের নামও ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। কেউ সেই চেষ্টাও করেনি। শুধু আকবর যে মোটেও 'মহামতি' ছিলেন না, আর পাঁচজন অত্যাচারী মুঘল সম্রাটদের মতোই ভারত-লুণ্ঠনের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে হিন্দু প্রজাদের নিগ্রহও নেহাত কম হয়নি সেটা এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। হ্যাঁ এটা ঠিক যে তাঁর বাপ-দাদাদের মতো কিংবা তাঁর উত্তরসূরীদের মতো অতটা হিন্দু- নিধনকারী ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে তাঁর রাজত্বকাল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হিন্দু- প্রজাবৎসল মুঘল সম্রাটের রাজত্বকাল হিসেবে দেখানোর চেষ্টাটাও যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ মাত্র, সেই সত্যটা সবার সামনে নিয়ে এসেছে কেন্দ্র।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন, মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে ইরফান হাবিবের চেয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার অনেক বেশি প্রামাণিক বলেই স্বীকৃত। তিনি আওরঙ্গজেব-সহ মুঘল সম্রাটদের সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন, তা প্রকাশ্যে আসার ঘটনায় এতো আশঙ্কিত কেন ইরফান হাবিবের নেতৃত্বাধীন ইতিহাসবিদগোষ্ঠী? এটা কি তাদের পুরোনো পাপ ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায়? তাঁদের মতো একদল নব্য ইতিহাসবিদ তকমাধারীর হাতে স্রেফ রাজনৈতিক মদতে যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো প্রথিতযশা বিশ্ববরেণ্য ঐতিহসিকদের কি নিগৃহীত করা হয়নি?

ইরফানদের আরও রাগ, কেন রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা হবে? প্রকৃত ঘটনা হলো, রামায়ণ-মহাভারতকে কেউ খাঁটি ইতিহাস বলছে না, কিন্তু পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে যে ইতিহাসের বীজ লুকিয়ে আছে, তাকে সযত্নে খুঁজে বার করে আনা এদেশের ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত দরকারি। কারণ ভারতীয় সভ্যতা এতটাই সুপ্রাচীন যে, ইতিহাসের সাধ্যে কুলোয় না তার তল পাওয়ার। সুতরাং পুরাণের ওপর নির্ভর করতেই হবে।

এতে হাবিবদের রাজনৈতিক লাইন গড়বড় হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মুঘল শাসনই আধুনিক ভারতের সূচনা করেছে, ভারতীয় সংস্কৃতি মেরেকেটে হাজার বছরের পুরোনো, অর্থাৎ মহম্মদ ও যিশুর জন্মের পরেই আধুনিক ইতিহাসের শুরু, এসব প্রমাণের রাজনৈতিক গুরুদায়িত্ব ইরফানদের কাঁধেই। সুতরাং বাঙালির চিরকালীন প্রবাদবাক্য 'যা নাই মহাভারতে তা নাই ভারতে' ইত্যাদি নস্যাৎ না করে দিতে পারলে শান্তি নেই। তাই মাখনলালের মতো প্রকৃত ইতিহাসবিদদের অবজ্ঞা করে এতদিন ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপারদের মতো পার্টি ইন্টেলেকচুয়ালদের মেনস্ট্রিম হিস্টোরিয়ানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইরফান এও বলেছেন, পাকিস্তানে যেমন মোহাম্মদ বিন কাশেমের সময় থেকে তাদের ইতিহাসের প্রকৃত সূচনা বলে দেখানো হয়, কারণ কাশেমের আমলে সিন্ধ প্রদেশের ইসলামীকরণ হয়েছিল, একইভাবে ভারতেও নাকি ইতিহাস কেবল হিন্দুদের গৌরবগাথাই দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে।

আসলে ইরফান হাবিবের অবচেতনে কোথাও তাঁর কৃতকর্ম ভেসে উঠেছিল, প্রকৃতপক্ষে ভারতের ইতিহাস শুরু মুঘল আমলে, পার্টিলাইন অনুসারে এই অপধারণার জন্ম তাঁদেরই কুকর্ম, তাঁদের পিতৃভূমি পাকিস্তানের অনুসরণে। আসলে এই বামৈস্লামিক ইতিহাসবিদদের সমস্যা হচ্ছে, তাঁরা স্বাধীনোত্তরকালে রাজনৈতিক মদতে যা ইচ্ছা করার অবাধ লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি বর্তমান জমানায় সিদ্ধ হওয়া বেশ মুশকিল। আর এই সহজ সরল সত্যটা তাঁরা বুঝেছেন বলেই 'ইতিহাস বিকৃতি' বলে এতো 'ক্ষোভে'র বহিঃপ্রকাশ। 'সেভ এডুকেশন' ফোরামের রাজনৈতিক অভিসন্ধি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ মহাপাত্রের কথায়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগঠন সর্বাত্মক লড়বে। সুতরাং তারই অঙ্গ হিসেবে এই 'ইতিহাস বিকৃতি'র অভিযোগে সরব হওয়াও যে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। □

আপনি জয়ী হোন দ্রৌপদী

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় গণতন্ত্রের পুজোর দালানে এক নতুন সাধিকা এলেন। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আসীন হওয়ার নির্বাচনে জিতলেন জনজাতি সমাজের প্রতিনিধি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। পুজোর দালানের অনুষঙ্গ এই জন্য যে সংবিধানকে শিরোধার্য এবং তাকে সদা আরাধ্য করাই তো রাজনীতিবিদদের প্রাথমিক কর্তব্য। সংবিধানকে সামনে রেখে দেশকে উন্নতির সোপানে পৌঁছে দেওয়াই তো জনপ্রতিনিধিদের সাধনা। সংবিধান চিহ্নিত নানা পদ ও তার ক্ষমতা বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতিই হলেন দেশের প্রথম ও প্রধান নাগরিক। এই সর্বোচ্চ পদে এর আগে জনজাতি সম্প্রদায় থেকে কেউ যে আসীন হতে পারে বা তেমন প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে— একথা কোনো রাজনৈতিক দল তার অলিখিত ইস্তাহারেও স্থান দেয়নি। তবু তা সত্যি হওয়ায় গণতন্ত্রের তথাকথিত চতুর্থ স্তম্ভ স্থানীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি যেন বড়োই ম্রিয়মাণ। এর কারণ সুস্থ গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে কাগজের ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শ ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিরাগ থাকতেই পারে। সেগুলি প্রকাশের যথাযোগ্য স্থান সম্পাদকীয় ও উত্তর সম্পাদকীয়তে নির্দিষ্ট আছে। সেখানে সমালোচনার অবকাশ পর্যাপ্ত। কিন্তু এখানে গ্রাহকের ভিত্তিতে প্রথম দিকে থাকা কাগজগুলি দেশের রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ সর্বোচ্চ পদের নির্বাচনের খবরটি প্রকাশ করতেই যেন মনমরা হয়ে পড়েছে।

এই সূত্রে বাজারি পত্রিকা জানাচ্ছে শ্রীমতী মুর্মু জিতলেও ভোট কম। এটি অত্যন্ত কম গুরুত্বের খবর হিসেবেই সুকৌশলে পরিবেশিত হয়েছে। দেশের প্রধান নাগরিক নির্বাচিত হওয়ার খবর banner headline হওয়ার যোগ্যতামান পেরোতে পারল না। মর্মান্তিক। আর এক ভগবানবিশ্বাসী নির্ভীক কাগজের প্রধান খবর রাষ্ট্রপতি নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২৪ সালে বড়োলোক প্রধানমন্ত্রী চান না, এটিই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বের। আর একজন খুব বড়ো করে মহামাননীয়ার ভাষণ উদ্ধৃত করে লিখেছে, মানুষের বৃষ্টিতে ভেসে যাবে ২০২৪-এর বিজেপি। হতে পারে। নির্বাচনের ভবিষ্যৎবাণী করতে অনেকেই ভালোবাসেন। প্রশ্ন সেটি নয়। প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের খবরটির প্রথম পাতায় উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন। যাতে যে কোনো পাঠক যাকে বলে একবার চোখ বোলালেই খবরটি জানতে পারেন। তার কৌতূহল বাড়ে। বিষয়টি দেখে মনে হলো এঁরা এই চতুর্থ স্তম্ভ-টম্ভ কিছু নয়। যাঁরা ঘর ঢালাই করা দেখেছেন তারা জানবেন ঢালাইয়ের তলায় দীর্ঘদিন বাঁশ লাগানো থাকে। একে বলে মুটের বাঁশ। এই কাগজগুলির খবর ও খবর পরিবেশক সাংবাদিকরা প্রত্যেকটি খবর মুটের বাঁশ হয়ে ঢালাইকে পাকা করতে সর্বদা সাপোর্ট দিয়ে বাজারে আনেন। ফলে সাধারণ পাঠক অযাচিতভাবে মিথ্যে খবর পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। যেমন প্রথম জনজাতি রাষ্ট্রপতি হওয়াটা তেমন কিছু নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে দ্রৌপদী মুর্মু অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। রাত সাড়ে তিনটের সময় উঠে পড়েন আর ঘড়ি ধরে রাত সাড়ে ন'টায় দীপনির্বাপণ হয়। তাঁর জীবনচর্যার পদ্ধতি দেখে অনুমান করা যায় রাষ্ট্রজীবনে গুরুদায়িত্ব সামলেও তিনি এই নিয়মানুবর্তিতা ভাঙতে দেবেন না।

যাই হোক, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদীদেবী এই নির্বাচনে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি সর্বকনিষ্ঠ, তিনি জনজাতি সমাজের প্রথম প্রতিনিধি, তিনি সমাজের একেবারে নীচের তলা থেকে নিজ কৃতিত্বে উঠে আসা মহিলা। তাঁর এই পথচলায় তিনি জীবনে শোকাবহ ঘটনার ঘনঘটা দেখেছেন। তিনি দু' দুটি ছেলেকে অকালে হারিয়েছেন। হারিয়েছেন স্বামী, মা ও ভাইকে। ৭ বছরের মধ্যেই এই বিয়োগান্তক ঘটনাগুলিকে সামলে জনজীবনে ফিরে এসে জনতার মধ্যে কাজ করতে গেলে যে মনের জোর ও আত্মিক শক্তির প্রয়োজন হয় তা বিরল বস্তু। তিনি নিত্য তাঁর সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজা ও ধ্যান করেন। দীর্ঘদিন নিরামিষ খান। তিনি শিবভক্ত।

কয়েকদিন আগেই বিহারের এক পারিবারিক সূত্রে ক্ষমতাশালী আক্ষরিক অর্থে মূর্খ এক নেতা তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্ভাব্য মূক মূর্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানেন না পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের আমলে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনী দুটি বিল রাজ্যপাল থাকাকালীন শ্রীমতী মুর্মু অনায়াসে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবুন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ছিলেন একই দলের অর্থাৎ বিজেপির। এখন দেখতে হবে ভোট প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির স্থানগুলি কোথায়?

(১) তেলেঙ্গানা : এখানে তিনি ভোট

ফঃ ২

পেয়েছেন ২.৬ শতাংশ। মনে করুন কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কথা। গায়ে সর্বদা রেশমের লুঙ্গি ও সার্ট। গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে ১০টি আংটি। পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে ছেলেকে গদিতে বসাতে সদা উৎকণ্ঠিত। আসাদুদ্দিন ওয়েসির সঙ্গে ভোট সমঝোতায় তাঁর অসুবিধে নেই। বিজেপি ওখানে জমি পাচ্ছে বলে এত খেপে গেছেন যে সাধারণ শিষ্টাচার মেনে (ওই যে গণতান্ত্রিক আচার) বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে নিতেও যাননি।

(২) কেরল : এখানে মাত্র ০.৭ শতাংশ ভোট কী করে পেয়েছেন সেটাই রহস্যময়। এখানে ৮০ শতাংশ সংখ্যালঘু ও বামপন্থী (সোনা চুরিতে অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী) সদাই দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত। বিদ্বেষের কারণ বোধগম্য।

(৩) পঞ্জাব ও দিল্লি যথাক্রমে ৭ ও ১২ শতাংশ। এখানকার কোনো প্রতিনিধি লোকসভায় নেই। কিন্তু বিধানসভাগুলিকে মুফতে মাল পাওয়ার মায়াজালে এখনও আসক্ত করে রেখেছেন কেজরিওয়াল। এই খাঁটি সোনা দলটি 'আপ' অর্থাৎ আপনা ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য করে না। এঁদের মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন সেরা 'ইমানদার আদমি' বলে ঘোষণা করেছেন কেজরিওয়ালকে। বহু বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর তিনি দীর্ঘদিন জেলবন্দি। কেজরিওয়ালের বন্ধু বড়ো উকিলের তো অভাব নেই। জামিন তারা বহুবার চেয়েছে, বিচারকরা কেজরিওয়ালের সঙ্গে একমত নন। তারা অকাট্য প্রমাণ নিয়েই তাকে আটকেছেন। তবে একটা জিনিস কেজরিওয়ালের মনে রাখা দরকার, ২০১২ সাল থেকে আজ অবধি তিনি গোয়া, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল, উত্তরপ্রদেশ সমস্ত জায়গাতেই ওই বিনা পয়সার জল আর বিদ্যুতের টোপ দিলেও মানুষ তার প্রায় সমস্ত প্রার্থীর জামানত জব্দ করেছে। ক্ষমতা দখলের উদগ্র বাসনায় তিনি যেভাবে রাজ্যকে দেনার দায়ে জড়াচ্ছেন তার দায় তো কেন্দ্রকেই নিতে হবে। আমরা তো যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় বাস করি। তিনি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, সবই জানেন। তবে মূল মন্ত্র আপ মানে আপনা।

(৪) মহারাষ্ট্রের এনসিপি-র মন্ত্রী দীর্ঘদিন জেলবন্দি। তাঁদের নেতা প্রফুল্ল প্যাটেলের ওরলির সম্মতি কালই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এরা তাঁকে ভোট দেয়নি।

(৫) পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত ভোট ২৪ শতাংশ। এটাও মূলত সাংসদদের কারণে। এখানকার শাসকদলের একজন সাংসদ জেল খাটতে খাটতে মারা গেছেন। একজন জেল থেকে বেরিয়ে মারা গেছেন। আরও মন্ত্রীটন্ত্রীরাও ২/৫ দিন খেটেছেন। অজস্র মামলা চলছে। আদালত, বিচারকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বেলাগাম দুর্নীতির জন্য তিরস্কার করছে। ওই চন্দ্রশেখর রাওয়ের মতোই ইনিও উৎকণ্ঠা আক্রান্ত। পারিবারিক শাসন কায়েম রাখতে বর্তমান শাসককে উৎখাত করে দিল্লি জয়ের অলীক স্বপ্নে মশগুল। ভোটের এই বিন্যাসগুলি দেখলে বোঝা যায় এঁদের রাজনীতির উদ্দেশ্য, অভিমুখ, মতলবের কাছে শ্রীমতী মুর্মুর রাজনীতি কতটা বেমানান। সেই সূত্রেই এই ধরনের জঞ্জাল চক্রের ভোট পাওয়াই বিড়ম্বনা।

ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল পদেও তিনি খবর অনুযায়ী নিতান্ত আটপৌরে ভাবেই আসীন ছিলেন। তিনি শুরুর দিকে বিদ্যালয়ে পড়াতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ বরাবরের। ময়ূরভঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষার আশায় তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে তিনি ভুবনেশ্বর গিয়েছিলেন। সামান্য জমিজমা থেকে পাহাড়পুরে স্কুলের জন্য জমিদান করেছেন। তৈরি করেছেন পাঠগৃহ যেখানে বিনামূল্যে জনজাতি সমাজের ছেলে-মেয়েদের পড়ানো হয়। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষটি রাত সাড়ে তিনটের সময় উঠে পড়েন আর ঘড়ি ধরে রাত সাড়ে ন'টায় দীপনির্বাপণ হয়। তাঁর জীবনচর্যার পদ্ধতি দেখে অনুমান করা যায় রাষ্ট্রজীবনে গুরুদায়িত্ব সামলেও তিনি এই নিয়মানুবর্তিতা ভাঙতে দেবেন না।

শেষ করার আগে দেখা যাক পরিবারতান্ত্রিক দলগুলির দ্বারা স্বাভাবিক কারণে অমনোনীত হলেও কারা তাঁকে সমর্থন উজাড় করে দিল। তাঁর জন্মরাজ্য ওড়িশার শাসকদল বিজেপি না হলেও সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক ও সাংসদরা তাঁকে ৯৪ শতাংশ ভোট দিয়েছে। কতটা নিখাদ ও সৎ মানুষ হলে নবীন পট্টনায়কের মতো এমন একজন বিদগ্ধ ও ব্যতিক্রমী মুখ্যমন্ত্রীর অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করা যায়?

অন্ধ্রপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, সিকিম তাঁকে ১০০ শতাংশ ভোট দিয়ে রেকর্ড করেছে। এই সমর্থনগুলির নিশ্চয়তা ও প্রতিশ্রুতি মনোনয়নের পরেই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যদলের ১৭ জন সাংসদ এবং দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ (১৮টি রাজ্য থেকে) রেকর্ড সংখ্যক ১২৬ জন বিধায়ক আপাত নিয়ম কানুন তুচ্ছ করে তাঁদের বিবেকের তাড়নায় দ্রৌপদী মুর্মুকে ভোট দিয়েছেন। এই রকম একজন জনপ্রিয় জনজাতি নেত্রীর বিরোধিতা করলে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই আশঙ্কায় জনজাতি অধ্যুষিত মধ্যপ্রদেশের ১৯ জন বিধায়ক (কিছু সাঁওতালও আছে), অসম থেকে ২২ জনের বড়ো দল তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। এই ধরনের ইতিবাচক খবরগুলি যেখানে রাষ্ট্রজীবনে অবহেলিত জনজাতিদের মূল স্রোতে উত্থান সূচিত হচ্ছে তা অপ্রকাশ্য থাকে। দেশ এক নতুন রাজনৈতিক আবহের মধ্যে প্রবেশ করছে, সেগুলিকে কিছুতেই খবর বৃত্তে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

অথচ এই উত্থানটি শুরু হয়েছে— (১) প্রধানমন্ত্রীর সর্বোচ্চ পদে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর (ওবিসি) প্রতিনিধি হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর আসীন হওয়া এবং সারা বিশ্বের সম্মান অর্জন, (২) পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তপশিলি জাতির সদস্য, (৩) সর্বশেষ দ্রৌপদী মুর্মু জনজাতি সম্প্রদায় থেকে ৩৪০ ঘরের রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করবেন সগর্বে, আপন অধিকারে। তাঁরা জনসংখ্যার ৯ ভাগ। কিন্তু কতিপয় ইংরেজি জানা ভণ্ড জনদরদিদের জন্য বদ্ধ জলায় আবদ্ধ ছিলেন। মহাশ্বেতাদেবীর অরণ্যের অধিকার পড়লে জানা যাবে এরা জলজঙ্গল মাটির জন্য লড়াই করে এসেছেন। সিধু-কানু-আর ভগবান বিরসা মুণ্ডার রক্ত বইছে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ধমনীতে। তিনি জয়ী হোন। □

তিস্তা সেতলওয়াড়ের ছকে সোনিয়ার হাত

তিস্তা সেতলওয়াড় নরেন্দ্র মোদীকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ আহমেদ প্যাটেলের থেকে ৩০ লক্ষ টাকা নেন। কংগ্রেসের কীর্তি ফাঁস হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছেন তিস্তা।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

'In Gujrat, too, this Goebbelsian principle was used to malign the Narendra Modi regime, to accuse Modi of political conspiracy...' (এম ভি কামাথ)

যতক্ষণ না প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন হচ্ছে ততক্ষণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে বদনাম হওয়া মুখ্যমন্ত্রী কী করবেন? জনসমাবেশ? ভাষণ? নিজেই নিজেকে ক্লিনচিট? হ্যাঁ এমনই হয়। প্রায়ই হয়। কিন্তু ২০০২-এর ১২ এপ্রিল গোয়াতে যেবার বিজেপির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ নির্বাচন ছিল সেবার সেখানে তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে বলেন— আমি জনতার রায়ে পুনরায় এই স্থানে ফিরব। 'I would prefer to sit here as a general executive member and not as a Chief minister'— গুজরাট দাঙ্গার পর মোদী বিরোধিতায় তখন দেশ ভাসছে। ভাসাচ্ছে তৎকালীন কংগ্রেস স্পনসরড বেশ কিছু মিডিয়া। বোধহয় কেউ ভোলেনি বেশ কিছু বছর পরে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ ব্যাঙ্গালোরের Deccan Herald-এর সেই সম্পাদকীয় 'hate Modi'। গোধরা হত্যাকাণ্ড, গুজরাট দাঙ্গা এবং ১৯ জুলাই ২০০২, নরেন্দ্র মোদী বিধানসভা ভেঙে দিলে কংগ্রেসের সামনে রাজ্যজয়ের স্বপ্ন তখন ছুটছে। তীব্র আক্রমণ এবং বিজেপি বিরোধিতার মাত্রাহীন নির্লজ্জতার মাঝেই ৮ ডিসেম্বর পাভি জেটপুরে নির্বাচনী প্রচারে লালকৃষ্ণ আডবাণী প্রথমবার বলেন, 'Modi who is being described as a demon by the Congress, is actually the most sincere honest man of integrity committed to his duty...'' ঠিক সে সময় কংগ্রেস শঙ্কর সিংহ বাগেলাকে দলে পেয়ে মোদী কুৎসার বাড়তি রসদ পায়।

২০০২ সালে গুজরাটের বিজেপি সরকারকে কালিমালিপ্ত করা এবং নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক সম্ভাবনার বারোটা বাজাতে সবরকম দুরভিসন্ধির একশো শতাংশ অপপ্রয়োগ করেছিল জাতীয় কংগ্রেস। সম্প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ে নরেন্দ্র মোদী গুজরাট দাঙ্গা বিষয়ে ক্লিনচিট পেয়েছেন এ খবর যতো না উত্তেজনা তৈরি করছে তার চেয়ে অনেক বেশি লজ্জার। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় থাকা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অসাংবিধানিক আচরণ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল মোদী হঠাও। দাঙ্গার

পরবর্তীতে মোদী অপবাদ এবং মিথ্যা খবরের জাল বুনতে সেদিন সদা প্রস্তুত ছিলেন সমাজকর্মী ছদ্মবেশী হিন্দুবিরোধী তিস্তা সেতলওয়াড়। মহামান্য ভারতীয় শীর্ষ আদালত তিস্তার দুরন্ত মিথ্যাচারের যে খরস্রোত এবং তার উৎস প্রদর্শন করেছেন তাতে নিশ্চিত হওয়া গেছে উনি সোনিয়া ও কংগ্রেস সরকারের ঘরের মেয়ে। যিনি সমাজসেবকের আড়ালে 'Ulterior design by exploiting emotions'-এর খলনায়িকা। ২০০৭-এ যে তিস্তাকে কংগ্রেস সরকার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে তিনি গুজরাট দাঙ্গা পীড়িতদের জন্য নির্ধারিত অর্থ তছরূপকারীদের একজন। এ অভিযোগ যিনি করেছেন তিনি স্বয়ং তিস্তারই সহকর্মী রাইস খান! রাইস খানের অভিযোগ প্রমাণ করে তিস্তার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সবরঙ্গ কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ আইনের কোনো তোয়াক্কা না করেই ফোর্ড ফাউন্ডেশনের থেকে ২.৯ লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান নেয়।

পরবর্তীতে গুজরাট পুলিশের তদন্তে প্রমাণিত হয় তিস্তা এবং তার স্বামী জাভেদ দাঙ্গা বিধ্বস্তদের সাহায্যের অর্থে নিজেদের ভোগবিলাস চালায়। ২০০৮-১৩ সালের মধ্যে যে পরিমাণ বিদেশি অর্থ ওই সংস্থায় এসেছে তার ৪৫ শতাংশ গেছে তিস্তার ভোগে। তাইতো প্রতি বছরে গড়ে ১১৩ বার বিমানের হাওয়া খেয়েছেন সমাজকর্মী। তিস্তা তার দুর্নীতির বেগ বাড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ (২০১০-১৩) ১.৪ কোটি টাকা রায়ট ক্ষতিগ্রস্ত সেবার নামে আত্মসাৎ করে। এবং মোদী বিরোধী আগুন উসকানোর জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের অর্থ কপিল সিব্বালের কৃপায় তিস্তার কাছে আসে। এটা নিশ্চিত তিস্তার মোদী বিরোধী গতিবেগ সেসময় কংগ্রেসের সৌজন্যে স্রোত পেয়েছে, বিষাক্ত খবর রটনার টারবাইনে মিথ্যাচারের বিদ্যুতে মিডিয়াকে পুষ্ট করেছে। জাকিয়া জাফরি যিনি রায়টে নিহত কংগ্রেস সাংসদ ইশান জাফরির বিধবা স্ত্রী, তিনি সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করলে ঝাঁপিয়ে বল লুফে নেয় তিস্তা। তাদের প্রকৃত সাহায্য এবং মানসিক সহায়তা ছেড়ে সর্বত্র তখন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব উৎপাদন চলছে। যা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারে 'devoid of merit'! তিস্তা সেতলওয়াড় অর্থ তছরুপ করেছেন; কংগ্রেসের তিনি স্নেহলতা, মিথ্যা সংবাদ সংক্রমণে সিদ্ধহস্তা এবং নীতিতে নয়, উদ্দেশ্যে মোদী বিদ্বেষী। তা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কংগ্রেসের আদরে এলিট ক্লাসের এমন অনেকেই ছিলেন যারা দায়িত্ব নিয়ে মোদীর কলঙ্ক এঁকেছেন। পিছিয়ে থাকবেন কেন অরুন্ধতী রায়? তেহলকা ওয়েবসাইটে ১৯ এপ্রিল জনৈক মুসলমান গর্ভবতীর উপর আক্রমণ এবং তার উদর চিরে ভ্রূণ ধ্বংসের যে বর্ণনা ছিল তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও পাশবিক। কিন্তু ৬ মার্চ বিবিসি এবং ২০ মার্চ টাইমস অব ইন্ডিয়াও সে বিষয়ে উল্লেখ করলে বর্ণনার গোঁজামিল জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে।

অরুন্ধতী রায় বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করলেও পরবর্তীতে রাজ্যসভার সাংসদ বলবীর পুঞ্জ গুজরাট পুলিশের কাছে এ সংক্রান্ত কোনো যথার্থতা পাননি। যেই না গুজরাট পুলিশ অরুন্ধতী দেবীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে ডাকে এবং তদন্তে সাহায্য চান তিনি বলেন পুলিশের সমন করার অধিকারই নেই। আউটলুক ম্যাগাজিনে অরুন্ধতী দেবী রিপোর্ট করেছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ইশান জাফরি-সহ তাঁর কন্যাকেও হত্যা করা হয়। এতো দুঃখের মধ্যেও মজার বিষয় এটাই নিহত ইশান জাফরির পুত্র লিখিত ভাবে জানান তার ভগিনী রায়টের সময় দেশেই ছিলেন না। ছিলেন মার্কিন মুলুকে। যেই না অরুন্ধতী দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় উনি টাইম ম্যাগাজিন এবং একটি ইন্ডিপেনডেন্ট ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের রেফারেন্স দিয়ে দায়িত্ব এড়ান। মোটের উপর পরিষ্কার যে কংগ্রেস স্পনসর্ড মোদী কলঙ্কের টিআরপি তখন চড়া। দাঙ্গা কখনোই অভিপ্রেত নয়। কিন্তু তা যখন রাজনৈতিক কুৎসার হেতু হয় তখন তা সার্বিক রাজনীতিকে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে উপনীত করে। মিডিয়া আরও কিছু রটনা করেছিল সে সময়।

যেমন— সারা গুজরাট জ্বলছে। কিন্তু সত্যি এটাই ২৪৮টি শহর এবং ১৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ৪০টি স্পটে অসহিষ্ণুতার সংঘাত ঘটে। কে বলে শুধু মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত? এও মোদীর মুসলমান ফোবিয়া তৈরির এক পাকা অপপ্রচার। ১১ মে ২০০৫-এ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল (কংগ্রেস) সংসদ ভবনে তথ্য পেশ করেন রায়টে ২৫৪ জন হিন্দু এবং ৭৯০ জন মুসলমান নিহত। কিন্তু তিনি বলেন না ১,১৮০ জন হিন্দু এবং ১,১৬৪ জন মুসলমান আহত, ক্ষতিগ্রস্ত। রায়টের পর যখন তিস্তা অর্থ তছরুপের অনুঘটকে মিথ্যা মোদী নিন্দা করছে, তারই মধ্যে ১১ মার্চ ১৭০০টা গ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ২৫ এপ্রিল দ্য ডেইলি পাইওনিয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ মহরম পালিত হয় সারা রাজ্যে। এবং প্রায় ছ' হাজার হজ যাত্রী রাজ্যে নির্বিঘ্নে ফেরেন। অর্থনৈতিকভাবে গুজরাট তখনও দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্য। কিন্তু তিস্তাদেবীদের সৌজন্যে সংবাদমাধ্যমের একাংশ যে ভাবে অর্ধসত্য এবং অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছে তা কংগ্রেসের মাটি উর্বর করার কৌশল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

২০০২-এর ১০ মার্চ দ্য হিন্দু পত্রিকায় সেবন্তী নিন্নার নিবন্ধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেদিন কেমন ছিল মোদী বিরোধী রিপোর্টিং? ইন্ডিয়া ফার্স্ট ফাউন্ডেশন সেদিন দেশের ছ'টি জাতীয় স্তরের সংবাদপত্রের (টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমস, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য হিন্দু, দ্য টেলিগ্রাফ) প্রতিবেদনের ওপর দেশব্যাপী সার্ভে করে। এবং তাতে অঙ্ক বলে ২,২০৩ জনের স্যাম্পেল সাইজের মধ্যে ৪৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মতে মিডিয়া একপেশে ভূমিকায় উপস্থিত। এবং শুধুমাত্র পশ্চিম ভারতেই ৬৯ শতাংশ মানুষের একই রায়। যখন সমাজসেবার অন্তরালে তিস্তার মতো কিছুজন অপপ্রচারের গুরুদায়িত্বে দিনকে রাত করছেন তখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট চোখ এড়িয়ে যায়। তারা গুজরাটের আইন এবং আইনের ব্যবস্থার প্রশংসা করেছে। তারা উল্লেখ করেছিল সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নি সংযোগের পরেই সারা রাজ্যে সতর্কতা জারি হয়। কেন্দ্রীয়

সরকারের কাছে সেনা সহযোগিতার আবেদন যায়। পাশের রাজ্য থেকেও অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্সের আবেদন করেন নরেন্দ্র মোদী। রাজ্য পুলিশ যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার। কংগ্রেসের হুবহু পছন্দের ভাষা রিপোর্টে ছিল না, তাই এ সংবাদ খুব প্রচার পায়নি।

এতো অপপ্রচারের পরেও মোদী সম্ভাবনা আবার মাথা তুলেছিল ১২ ডিসেম্বর ২০০২ যখন জে এম লিঙ্গদ গুজরাটে একদফা নির্বাচনের ধ্বজা তোলেন। তার পরের ইতিহাস দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল পুনরায় বিজেপির জয়ে। মোদীর ক্লিনচিট বোধহয় ওটাই ছিল, মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আজ প্রমাণ সহযোগে তাতে সিলমোহর দিলেন। ১৬ ডিসেম্বর তো টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখতে বাধ্য হলো 'Modiism must be democratically acknowledge'। যে সেকুলারিজম- প্রেমী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল গুজরাট মানেই দাঙ্গা আর দাঙ্গা মানেই মোদী, তারা মানুষকে আসলে প্রকৃত সত্য ভুলিয়ে দিতে মত্ত ছিল। প্রকৃত তথ্য এটাই ১৯৬৯ গুজরাট রায়টে ৬৬০ জন নিহত, ১৯৮৫-র দাঙ্গায় ২০৮ জনের জীবন কেড়েছিল, ১৯৯০-এ প্রাণ যায় ২১৯ জনের। ১৯৭০-এর পর থেকে সব মিলিয়ে ৪৪০টি সাম্প্রদায়িক এবং সামাজিক অসহিষ্ণুতার ঘটনা ঘটেছিল সে রাজ্যে। সেকুলার কংগ্রেস তখন ক্ষমতায় ছিল তাই পরোক্ষ আঙুল তুলতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দিকে। কিন্তু ২০০২-এ সরাসরি মোদী তথা বিজেপি কলঙ্কের সব রাস্তা প্রস্তুত রেখেছিল কংগ্রেস।

তিস্তা সেতলওয়াড় নরেন্দ্র মোদীকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ আহমেদ প্যাটেলের থেকে ৩০ লক্ষ টাকা নিলেও এবং মোদী বিরোধী ষড়যন্ত্রে গুজরাটের তৎকালীন ডি জি আর বি শ্রীকুমার ও প্রাক্তন আইপিএস অফিসার সঞ্জীব ভাটকে ব্যবহার করলেও মোদীর এবং সার্বিক ভাবে বিজেপির নির্দোষ হওয়ার ঘণ্টা সেদিন বেজেছিল যেদিন রায়ট পরবর্তী গুজরাট আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাফল্য দেখায় এবং ঘুড়ি উৎসবে ঘুড়ি শিল্প পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মর্যাদা পায় ও বিশ্বের নজর কাড়ে। অভিযোগ অপবাদ অপপ্রচারের মেঘ কাটিয়ে কংগ্রেস মুক্ত আকাশে সাফল্যের ঘুড়ি ওড়া কে থামাবে? দাঙ্গার পরেও মোদীর গণতান্ত্রিক এবং নৈতিক জয় তো এতোদিন ছিলই বাড়তি একটা আইনি ভোকাট্টা জয়ী ঘুড়িও এবার উড়ছে। কংগ্রেসের মিথ্যার ফানুসে কে আগুন দেবে? তিস্তার কীর্তি ফাঁস শেষ জলটুকু ঢেলে দিয়েছে। □

আহমেদ প্যাটেল-সেতলওয়াড় গাঁটছড়া

গুজরাট সরকার গঠিত বিশেষ তদন্ত দল সিটি সিভিল দায়রা আদালতে দায়ের করা হলফনামায় জানিয়েছে যে, ২০০২ সালে তৎকালীন নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন গুজরাট রাজ্য সরকারকে অস্থিতিশীল করতে কংগ্রেসের এক শীর্ষনেতা সমাজকর্মী তিস্তা সেতলওয়াড়কে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এসআইটি-র দাবি, 'গোধরা ট্রেনে অগ্নিসংযোগ এবং তাকে

কেন্দ্র করে গোটা গুজরাটে অশান্ত পরিবেশ তৈরির জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল রাজ্যের বিরোধী দল। সেই সময় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা আহমেদ প্যাটেল সমাজ কর্মী তিস্তা সেতলওয়াড়কে অ্যাপয়েন্ট করে নানাভাবে মোদী সরকারকে কালিমা লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। এজন্য আহমেদ প্যাটেল ৩০ লক্ষ টাকা দেন তিস্তাকে। হলফনামায় সিট-এর তরফে বলা হয়েছে, 'দুই সাক্ষীর জবানবন্দি প্রমাণ করে যে সেতলওয়াড় অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। রাজ্যসভার তৎকালীন সাংসদ তথা কংগ্রেস সভাপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা আহমেদ প্যাটেলের নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছিল এই ষড়যন্ত্র।' প্রসঙ্গত, গোধরা দুর্ঘটনাকে সামনে রেখে তৎকালীন নরেন্দ্র মোদী সরকারকে উৎখাত করতে গোধরা কাণ্ডের কয়েকদিন পরেই আহমেদ প্যাটেলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিস্তা। সেখানে প্যাটেল তাকে মোটা অঙ্কের টাকাও দেন। কথামতো মোদী সরকারকে উৎখাত করতে কোনও পন্থাই বাকি রাখেননি সেতলওয়াড়। যদিও তার প্রোপাগান্ডায় আসন টলেনি মোদীর। একটি বেসরকারি নিউজ চ্যানেল দাবি করেছে যে, এই ঘটনাকে সামনে রেখে কংগ্রেস হাই কম্যান্ডকে পরবর্তীকালে ব্ল্যাকমেল করে সেতলওয়াড়। কংগ্রেসের কাছে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ পদও চেয়েছিলেন। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তিস্তা সেতলওয়াড় এখন হাজতে। তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করার দাবি জানিয়েছে খোদ এসআইটি। আদালত ক্লিনচিট দিল মোদীকে। □

ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে পিছিয়ে দেবার পিছনে কি হামিদ আনসারি

সুমন চন্দ্র দাস

ভারতের দ্বাদশতম উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার অধ্যক্ষ ছিলেন হামিদ আনসারি। ইউপিএ কংগ্রেস জোট সরকারের হয়ে ২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন। ১ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে তাঁর জন্ম তৎকালীন কলকাতা শহরে। ১৯৬১ সালে আইএফসি পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি ভারত সরকারের হয়ে প্রায় আটত্রিশ বছর ধরে কূটনীতিবিদ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, সৌদি আরবে ছিলেন। তিনি অস্ট্রেলিয়াতে ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত, আফগানিস্তানে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত, ইরানে ১৯৯০ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত এবং সৌদি আরবে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। ২০০০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটি চেয়ারম্যান ছিলেন ২০০৬ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত। সেই সময়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস সরকারের শাসনে আগাগোড়াই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বশেষে ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেছেন। তিনি তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগের দিন সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ অস্বস্তিতে রয়েছেন। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দেশে সর্বধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সহিষ্ণুতার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে'।

আপাতত হামিদ আনসারি বিতর্কের জালে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্বে থাকার সময় তিনি দেশের বহু গোপন তথ্য বিদেশে (বিশেষ করে পাকিস্তানে পাচার করেছেন। অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানের সাংবাদিক নুসরত মির্জা। তিনি জানান, তিনি নিজে ভারতে আসার পর বিভিন্ন গোপন তথ্য পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে পাচার করেছেন। তাঁর দাবি ২০১০ সালে হামিদ আনসারিই আমন্ত্রণ করে তাকে ভারতে নিয়ে আসেন। ইউটিউবার শাকিল চৌধুরি নুসরত মির্জার একটি সাক্ষাৎকার তুলে ধরে বলেন, ২০০৫ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে এই পাকিস্তানি সাংবাদিক হিসেবে বেশ কয়েকবার ভারতে আসেন। আর সেই সঙ্গে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে প্রদান করেন। এই তথ্য খুব চাঞ্চল্যকর ছিল। পাকিস্তানের সাংবাদিক হিসেবে তিনি ভারতে আসেন। ভারতে পাঁচটি শহরে যাবার কথা ভিসাতে উল্লেখ করেন। তিনি বেঙ্গালুরু, কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই ও পাটনাতে যান। নুসরত মির্জা আরও বলেন যে তিনি যে সময়ে ভারতে এসেছিলেন সেই সময় ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সালমন খুরশিদ কসুরিও ছিলেন। খুরশিদ তাকে বলেন এই আলোচনাসভায় পাওয়া

ভারতের ক্রা

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে সে দেশের সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী, রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা গ্ল্যাভকসমস ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোকে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে, এমনটাই কথা ছিল। ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন পেলে ভারত ভারী রকেট নির্মাণে সক্ষম হবে। এবং জ্বালানিও অনেক কম লাগবে। আমেরিকা অনেকদিন ধরেই ভারতের অগ্রগতির ওপর নজর রাখছিল। ইতিমধ্যেই ভারত ব্যালেস্টিক মিসাইল অগ্নি তৈরিতে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আমেরিকার আশঙ্কা, ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের প্রযুক্তি পেয়ে গেলে ভারত রকেট ও স্যাটেলাইট লঞ্চিং প্রোগ্রামে সুপারপাওয়ার হয়ে উঠবে। ভারতই একমাত্র উন্নয়নশীল দেশ যার আকাশচুম্বী সম্ভাবনা আছে এবং গবেষণার খরচ অত্যন্ত কম রাখার সামর্থও আছে। ভারত সফল হলে বিপদে পড়ে যাবে নাসা। এইসব কারণে আমেরিকা ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নানারকম বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইছিল।

ব্যাপারটা গ্ল্যাভকসমস এবং ইসরো যে জানত

তথ্য যেন পাকিস্তানের জেনারেল সেনাপ্রধান কায়ানিকে তুলে দেন। এই তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ। নুসরত মির্জা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি আইএসআই-এর হয়ে কাজ করতেন। পাকিস্তানি গুপ্তচরের সঙ্গে বিশেষ আঁতাত ছিল প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির, এমনটা স্পষ্ট করেন নুসরত মির্জা।

নাম্বী নারায়ণন

নুসরত মির্জা

অল ইন্ডিয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আদিশ আগরওয়াল বলেন, ২৭ অক্টোবর ২০০৯ সালে জামা মসজিদ ইউনাইটেড ফোরামের একটি আলোচনাসভায় নুসরত মির্জা উপস্থিত ছিলেন, তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির পাশের আসনে। নুসরত মির্জা সবসময় ভারত বিরোধী নীতির কথা শুনতে পছন্দ করতেন। পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট ম্যাচকে ভারতের বিরুদ্ধে হাইব্রিড যুদ্ধ বলে ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের কথা মনে করিয়ে দিতেন।

বিবিসি হিন্দি সাংবাদিক বিতিন খেরেকে নুসরত মির্জা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, (১৬ জুলাই ২০২২-এ ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে) ২০০৫ সালে একবার চণ্ডীগড়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২০০৯ সালের সেই কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের গুপ্তচরদের সেখানে ডাকা হয় বিশেষ করে ফিনিস্ট, ইজরায়েলের মোসাদ প্রভৃতি গুপ্তচরের লোকেরা সেখানে ছিলেন। উল্লেখ্য মির্জা নিজে বলেন ভারতে ২৬/১১ মুম্বাইয়ে জঙ্গি হামলা আমেরিকা করিয়েছে।

য়োজেনিক প্রকল্প ও হামিদ আনসারি

না, তা নয়। আমেরিকা যে মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিমের (এমটিসিআর) জুজু দেখিয়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরে আপত্তি করতে পারে সেটা জানাই ছিল। তাই তারা অন্য পথ নিলেন। ঠিক হলো, গ্ল্যাভকসমস আউটসোর্সিঙের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে কেরল হাইটেক ইন্ড্রাসট্রিজকে (কেলটেক)। ইসরো তা গ্রহণ করবে কেলটেকের কাছ থেকে। গ্ল্যাভকসমসের ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি বিভাগের অফিসার-ইন-চার্জ আলেক্স ভ্যাসিন এবং ইসরোর সেইসময়ের চেয়ারম্যান ইউ.আর.রাও দু'জনেই ভেবেছিলেন কেলটেকের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর হলে এম.টি.সি.আর-এর ঝামেলায় পড়তে হবে না। কিন্তু হলো ঠিক উলটো। আমেরিকা এম.টি.সি.আর অমান্য করা হয়েছে বলে ইসরো আর গ্ল্যাভকসমসের ওপর স্যাঙ্কশন চাপিয়ে দিল। এই প্রযুক্তি মিসাইল নির্মাণে ব্যবহার করা হবে না, শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেই ব্যবহার করা হবে— বারবার একথা বোঝানোর পরেও বরফ গলল না। বছর তিনেক পর পরিস্থিতি পালটায়। ১৯৯৪ সালে রাশিয়া ভারতকে মোট সাতটি কেভিডি-১ ইঞ্জিন দেয়, যদিও প্রযুক্তি

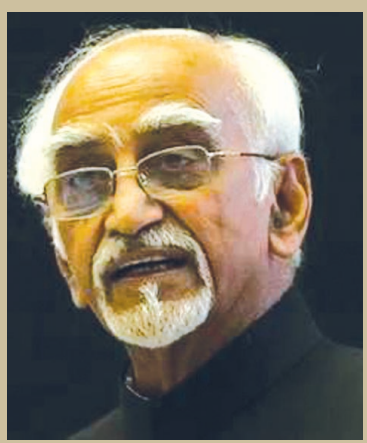

হস্তান্তর করা হয়নি। এক্সপোর্ট না করার ও আধুনিকীকরণ না করার শর্তে ভারত ইঞ্জিন পায়। এরপরের ঘটনা অনেকটা থ্রিলারের মতো।

সেই সময় ভারতের ক্রায়োজেনিক প্রকল্পের টিম লিডার ছিলেন নাম্বী নারায়ণন। আমেরিকা জানত ভারতের ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তির গবেষণায় নাম্বী নারায়ণনই আসল লোক। সুতরাং নাসার বিপদ আশঙ্কা করে এবার আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সি.আই.এ খেলায় নামল। কেরল পুলিশ গ্রেপ্তার করল নাম্বী নারায়ণনকে। তার বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্য বিক্রির অভিযোগ উঠল। তারপর ১৯৯৭ সাল। ততদিনে অনেকেই বুঝেছেন এই ঘটনায় কার হাত আছে। সতীশ ধাওয়ান, ইউ.আর.রাও, যশপাল, রোধাম নরসিংহ, কে. চন্দ্রশেখর এবং টি.এন.শেষণ সরকারকে সে কথা জানালেন।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে হামিদ আনসারির কী সম্পর্ক? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভারতের গুপ্তচর সংস্থা র'-এর প্রাক্তন আধিকারিক এন.কে. সুদ। তিনি বলেছেন নাম্বী নারায়ণনকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে ফাঁসানোর পিছনে রয়েছে হামিদ আনসারির ডান হাত হিসেবে পরিচিত রতন সেহগল। মজার ব্যাপার হলো রতন সেহগল নিজেই সি.আই.এ-র একজন চর। এখন আমেরিকায় বহাল তবিয়তে আছে। সুতরাং ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরে হামিদ আনসারির ভূমিকা নিয়ে এখনই তদন্ত হওয়া দরকার। ■

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভারতীয় গুপ্তচর আধিকারিক এন কে সুদ সংবাদমাধ্যমে খোলসা করেছেন হামিদ আনসারি যখন ইরানে কাজ করছিলেন সেই সময় ভারতীয় গুপ্তচরকে ইরান সরকার গ্রেপ্তার করলে তৎকালীন ভারতীয় কনসুলেট হিসেবে তিনি সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেননি। মোট চারজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে ইরান সরকার। কিন্তু এর ফলে ইরান-সহ ইসলামি দেশগুলিতে ভারতীয় কূটনৈতিক কাজকর্মে ব্যাপক খারাপ প্রভাব পড়ে।

হামিদ আনসারি এমন একজন ব্যক্তি যিনি দু' দুবার ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হয়ে কার্যকাল শেষ হওয়ার আগের দিন বলেন ভারতের মুসলমানরা ভীষণ অস্বস্তিতে রয়েছেন। মুসলমান সমাজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। হিংসা দেশে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ সংস্কৃতির উপর আঘাত করছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান দ্রুত করতে হবে— ইত্যাদি বক্তব্য প্রকাশ করে সংখ্যালঘু ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের রাজনৈতিক ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য, এই প্রশ্নগুলি প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এবং তথাকথিত কংগ্রেস দলের শাসন অবসানের অর্থাৎ ২০১৪ সালের পর থেকেই মনে হলো। ধর্মনিরপেক্ষ দেশের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করার সময় তিনি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন না, কিন্তু কার্যকালের মেয়াদ অতিক্রম করার একদিন আগে এমন মনে হওয়াটা ভীষণ ভাবে রাজনৈতিক ও কূটষড়যন্ত্রমূলক। পাশাপাশি একজন উপরাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস সরকারের বিদেশ মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্ক এক প্রকার ভারতীয়দের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় ছাড়া আর কিছু না। দেশদ্রোহিতার সমতুল্য এই কুকর্ম।

এবার আমরা আলোচনা করব ভারতের মহাকাশ গবেষক বৈজ্ঞানিক নাম্বী নারায়ণনের প্রসঙ্গে। প্রশ্ন উঠতে পারে নাম্বী নারায়ণনের সঙ্গে হামিদ আনাসারির কী সম্পর্ক? হ্যাঁ সম্পর্ক আছে। গুপ্তচর বৃত্তির কথা প্রসঙ্গেই। নাম্বী নারায়ণনের জন্ম ১২ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীতে। শিক্ষা গ্রহণ থিয়াগরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মাদুরাইয়ে। তারপর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে (এমএসই)। তিনি ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণাগারের বিশেষ আধিকারিক ছিলেন। ১৯৯৪ সালে কংগ্রেস সরকার তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকার অভিযোগ আনে যে নারায়ণ নিজে ইসরোর গোপন তথ্য বিদেশে পাচার করেছেন। নাম্বী নিজে গুপ্তচর ছিলেন বলে অভিযোগ করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। পরবর্তীতে মামলা সিবিআইয়ের হাতে গেলে সিবিআই তদন্ত শুরু করে। তদন্তের পর সিবিআই কোর্টে তাকে কংগ্রেস সরকারের আনা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। সেই সঙ্গে ১৯৯৮ সালে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট নাম্বী নারায়ণন গুপ্তচর বৃত্তিতে যুক্ত নন বলে রায় দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মহামান্য কোর্ট সেই সঙ্গে নারায়ণকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তাঁর লেখা বিখ্যাত 'রেডি টু ফ্লাই' বইতে স্পষ্ট করে এই কথা লিপিবদ্ধ করেছেন নারায়ণ। আরও পরবর্তী সময়ে ২০১৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে তৃতীয় অসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করে। প্রশ্ন হলো, একজন মহাকাশ বিজ্ঞানীকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে জীবনের একটা সুবর্ণ সময় মহাকাশ গবেষণার কাজ থেকে বঞ্চিত করা হলো। ভারতের মহাকাশ গবেষণার জন্য তা ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। নাম্বী নারায়ণ ক্রায়োজনিক প্রোজেক্টে কাজ করছিলেন। এই প্রকল্প সফল হলে ভারতের মহাকাশ গবেষণা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত। আমেরিকা ও পাকিস্তানের চাপে এই কাজ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই ষড়যন্ত্রে হামিদ আনসারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এমন অভিযোগও উঠছে।

একজন সত্যনিষ্ঠ দেশভক্তের উপর মিথ্যা অভিযোগ এবং দেশ ও সমাজের প্রতি কংগ্রেস সরকারের প্রবঞ্চনার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একজন উপরাষ্ট্রপতি যদি ভারতের সর্বনাশ আকাঙ্ক্ষী আইএসআইকে গোপন তথ্য পাচার করে থাকেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেশের সুরক্ষা যদি উপরাষ্ট্রপতির হাতেই সুরক্ষিত না থাকে তাহলে কার কাছে সুরক্ষিত থাকবে? এটা একটা বড়ো প্রশ্ন, যে দলটি দেশে সবচাইতে বেশিদিন শাসন ক্ষমতা চালিয়েছে সেই জাতীয় কংগ্রেসের হাতে দেশ কতটা সুরক্ষিত ছিল সেই প্রশ্নটাও আজকের সময়ে ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। একদিকে একজন বৈজ্ঞানিককে মিথ্যা অভিযোগের শিকার হতে হয়েছে, অপর দিকে কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বলে উপরাষ্ট্রপতি পদে দশ বছর থেকে দেশের সম্পদ বিক্রি করে গেছেন হামিদ আনসারি। কংগ্রেসের দুই রকম আচরণ বড়োই বিচিত্র। □

বিশ্ব ধূমপান মুক্ত দিবস পালিত হলে কি ধূমপান মুক্ত বিশ্ব পাওয়া যায়?

পৃথিবী যদি ধূমপান মুক্ত হতো কেমন হতো! রাম, শ্যাম, যদু, মধু, রহিম, করিমকে ধূমপান করতে দেখি মাঠে-ময়দানে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, ট্রেনে-বাসে সদা সর্বত্র। মনে হয় পৃথিবী নামক কারখানা থেকে দৈত্যাকার গরম ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের ফুলকি ছেড়ে অনর্গল নির্গত হচ্ছে। মনে হয় গরম চুল্লির পাশে বসে আছি যে কোনো সময় পুড়ে মরতে পারি। অত্যধিক ধূমপানের ফলে বাতাসে যদি কখনো অক্সিজেন-কার্বনডাইঅক্সাইডের আনুপাতিক ভারসাম্য হারিয়ে কার্বডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়, তখন কী হবে? তখন পৃথিবীর জীবজন্তু-সহ গাছপালা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তখন পৃথবী পরমাণুবোমা ফাটার মতো ছাই-ভস্মে পরিণত হবে। দূষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া মিলে সৃষ্টি করে আয়লা, লায়লা, ফেনি, সুনামি, আমফানের মতো এক একটা দানব যারা সমুদ্রের গর্ভ থেকে বের হয়ে উল্কার মতো ধেয়ে এসে পৃথিবীকে ছারখার করে দেয়। আমরা তখন আদিম যুগের মতো অসহায় হয়ে ঘরে বন্দি থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনো পথ পাবো না।

নেশামুক্ত না হয়ে যদি নেশাযুক্ত পৃথিবী হয়, কেমন হয়? ডান হাতের দুই আঙুলের মধ্যে ধরে রাখা জ্বলন্ত সিগারেট দু' ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে গরম কালো ধোঁয়া শ্বাসনালীর ভিতর দিয়ে পাকস্থলীতে জমা হতে থাকে। পেটের ভিতরে কালো গরম ধোঁয়া আর বাদবাকিটা মুক্ত বাতাসে অবাধ বিচরণ। শরীরের মতো পৃথিবীটা বেলুনের মতো কখন ফেটে যায় কে জানে। নেশাখোরদের মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে পৃথিবীরও মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। গানের ভাষায় পৃথিবীটা কালো ধোঁয়া বলে আর মনে হয় না, এখন সে কালোই ধোঁয়া। বাংলা ছায়াছবির একটা হাস্যোদ্দীপক দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। অভিনেতা সম্ভবত চিন্ময় রায় হবেন। তিনি সিগারেট টানতে টানতে রুমে প্রবেশ করে চেয়ারে বসছেন। বাঁ পায়ের হাঁটুর উপর ডান পায়ের হাঁটু নাচাতে নাচাতে খোশ মেজাজে সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছেন। টেবিলের উপর থেকে বাম হাতে সকালের খবরের কাগজ নিয়ে চোখ বোলাচ্ছেন। এমন সময় তাঁর ভাগনি প্লেটে করে এককাপ গরম চা হাতে দিলে সিগারেটটা ডান পায়ের দুই আঙুলের মধ্যে রেখে ডান হাতে চায়ের প্লেটটা ধরলেন। সিগারেটের সঙ্গে চায়ের চুমুক, খবরের কাগজের উপর চোখ রেখে তিনটে কাজ সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। নেশার সঙ্গে পানাসক্তে তিনি খোশ মেজাজে। এই বাংলা ছায়াছবির নামটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু স্মৃতি হাতড়ে এই মুহূর্তে ওই নামটা মনে করতে পারছি না।

এমন নেশাগ্রস্ত পৃথিবীর নেশামুক্ত করার দায়ভার কে নেবে? এমন নেশাগ্রস্ত পৃথিবী যদি নেশামুক্ত হতো, কেমন হতো। বৈদিক, শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনে মুক্ত বাতাসে আধুনিক জীবন কেমন হয়! সেটা এখন স্বপ্নমাত্র। এখন একটা কিনলে একটা ফ্রির মতো সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে দেওয়ালে, রাস্তায় সর্বত্র খৈনি, পানপরাগের পিকের ছড়াছড়ি। জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পাপ কাজে পৃথিবীকে কলঙ্কিত করছি। পুণ্য অর্জনের জন্যে কখনো তার কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিনি। এমন কালো ধোঁয়ার নিকোটিনের গন্ধে পৃথিবীতে ফুলের গন্ধ কখনো পাওয়া যায়?

—সুবল সরদার,
মগরাহাট দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি

সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক দুর্নীতি যা মানুষকে হতাশ করেছে। সাধারণ মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। দুর্নীতি কীসে নেই? 'তোমার পায়ের পাতা, সবখানেই পাতা, কোনখানে রাখবো প্রণাম'।

লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর জীবন বিপর্যস্ত। তারা এককথায় দিশাহারা। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি। একটা হাস্যকর পরিস্থিতি। শিক্ষক নিয়োগ হয়ে গিয়েও দুর্নীতির বিপাকে পড়ে শিক্ষকতা থেকে বরখাস্ত এবং কোর্টের নির্দেশে মাহিনা ফেরত। একে হাস্যকর বলবো না তো কী!

এই লজ্জাকর পরিস্থিতি কেউ দেখেছে আগে কখনও? সব কাজই দুর্নীতিতে ভরা। দুর্নীতি শব্দটা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে অবাক হবার কিছু নেই, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। সমস্ত দুর্নীতি এখন আদালতের উপর নির্ভরশীল। সিঙ্গলবেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর মানুষ তাকিয়ে আছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? যা ক্ষতি হবার তা তো শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরই হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? কে তার জবাব দেবে?

—সঞ্জয় ব্যানার্জি,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিহাদ ঘোষণা করেছেন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। সেটা তিনি করতেই পারেন। কিন্তু জানা প্রয়োজন এই জিহাদ শব্দটি কোথাকার? আর এর অর্থই-বা কী? জিহাদ শব্দটি আরবীয়। এর অর্থ সংগ্রাম। ভালো কথা। কিন্তু সংগ্রামটা কীসের আর কার বিরুদ্ধে? উত্তরটা জানা প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় বর্বর পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই জিহাদ বলা হয়। Anwar Saikh

'This is Jehad' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'a holy war in the way of a Allah' as well as 'a defensive struggle against unbelievers' তাহলে প্রশ্ন ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক যে, ২১-এর মঞ্চ থেকে জিহাদের আহ্বান জানানোর মূল উদ্দেশ্যটা কী? তৃণমূল সমর্থক মুসলমানদের সমাবেশে একত্রিত করা এবং পরবর্তীকালে তাদের সাহায্যে সারা রাজ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা, যেমনটা আমরা মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করলাম হাওড়ার কোনা রোড সংলগ্ন মুসলমান অধ্যুষিত কিছু অঞ্চলে। পথ অবরোধ করে, যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিয়ে এমনকী আসন্ন প্রসবাকে অ্যাম্বুলেন্সেই প্রসব করাতে বাধ্য করে। মরণাপন্ন হার্ট পেসেন্ট বা ক্যানসার পেসেন্টকে হাসপাতালে যেতে বাধা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সেই বসে থাকতে বাধ্য করে এবং দোকান বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে সারা রাজ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করাটাই কী মূল উদ্দেশ্য হলো?

উত্তরটা জানা নেই। আধুনিক বিশ্বে জিহাদ তার jurisprudence-এর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিছু ইসলামি ধর্মগুরু জিহাদের হিংসাত্মক আগ্রাসী অর্থ বানিয়ে তার ক্লাসিক্যাল ব্যাখ্যাকে অর্থহীন করে তুলেছে। ভারতের ভেতরে এই সন্ত্রাসের রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থনের অভাব কখনোই হয়নি। ভারতের তথাকথিত কমিউনিস্টরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দুদের যে কোনও ধর্মীয় কাজের বিরোধিতা করে অথচ জিহাদি ও কট্টরপন্থী মুসলমানদের স্বাভাবিক বন্ধু হিসেবে কাজ করে থাকে। মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্যটা কী? একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জিহাদের ডাক দেওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহিত হয়ে উঠে সরকারি সম্পত্তি তো বটেই রাজ্যের জনগণের সম্পত্তিও ধ্বংসের কাজে তৎপর হয়ে উঠবে। তখন কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু অবশ্যই তৎপর হয়ে উঠবে এবং জনরোষ স্তব্ধ করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। সেটা মমতা ব্যানার্জি ভেবে দেখেছেন তো?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার।

রাধাকৃষ্ণান ও শ্যামাপ্রসাদ

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের প্রথম আলাপ ১৯২১ সালে। শ্যামাপ্রসাদ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এদিকে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণানও ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তাঁকে এনেছিলেন তাঁরই পিতা উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের প্রথম আলাপে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করেছিল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের ব্যবহার গুণেই অল্পদিনেই দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা।

রাধাকৃষ্ণান পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদের বিষয়ে লেখেন--- তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ও দৃঢ় মানসিকতার মানুষ। তাঁর কর্মচঞ্চল ব্যক্তিত্বের নিকট যাঁরাই এসেছিলেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। যদিও তিনি বহুদিন হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত, তবুও তাঁর মানবিক ধর্মবোধ কখনো সংকীর্ণ মানসিকতার মোড়কে মোড়া ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি ছিলেন সতত সহানুভূতিশীল। তাঁদের স্বাদেশিকতা শুধু দেশকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়নি, দেশের সুমহান আদর্শকেও তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা ছিল বর্ণময়— যার প্রকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন ভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যেরও কিছু কিছু দিক উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর মধ্য দিয়ে। হিন্দুত্ব নয় শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত ভারতীয়ত্বের প্রতীক বা প্রবক্তা। তাই রাধাকৃষ্ণান শ্যামাপ্রসাদকে আধ্যাত্মিক আলোকে বিশ্লেষণ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তাঁর এই বিশ্লেষণটি আজকের দ্বন্দ্বমুখর সময়ে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য।

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

হরিয়ানায় হিন্দুশূন্য গ্রাম

গত ১১ জুলাই স্বস্তিকা পত্রিকায় সুদীপ নারায়ণ ঘোষের লেখা 'হরিয়ানার মেওয়াতে জেলার বহুগ্রাম হিন্দু শূন্য' পড়লাম। আমি বুঝতে পারলাম না এই লেখার মাধ্যমে প্রতিবেদক ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? প্রতি ছত্রে শুধু পৌরুষহীনতার কথা। তাঁর লেখানুযায়ী মনে হচ্ছে মেওয়াত জেলা যেন ভারতে অবস্থিতই নয়। যদিও বিজেপি সরকার আছে সেখানে। যোগীজীর কাছে শেখা উচিত কীভাবে রাজ্য চালাতে হয়। ভবিষ্যতে এইরকম নিরাশাজনক কোনো প্রতিবেদন স্বস্তিকাতে প্রকাশ না করলে ভালো হয়।

—সুরজিৎ ঘোষ,
সিউড়ী, বীরভূম।

স্বস্তিকার 'মিসিং লিংক' এক মননশীল সংযোজন

স্বস্তিকা পত্রিকা বরাবরই পাঠকের ভাবনাচিন্তাকে উদ্দীপিত করে থাকে। ইদানীং সংযোজিত হয়েছে 'মিসিং লিংক' নামে গবেষণাধর্মী লেখা। গত ১৬ মে 'রামায়ণের বানরসেনারা ছিল ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়' লেখা দিয়ে শুরু করেছেন লেখক সন্দীপ চক্রবর্তী। পরপর বেশ কয়েকটি সংখ্যায় লেখা প্রকাশ হয়েছে। স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগ এরকম যুক্তিশীল লেখা পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

—ভবতোষ সিংহ,
রবীন্দ্রপল্লী, শিলিগুড়ি।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

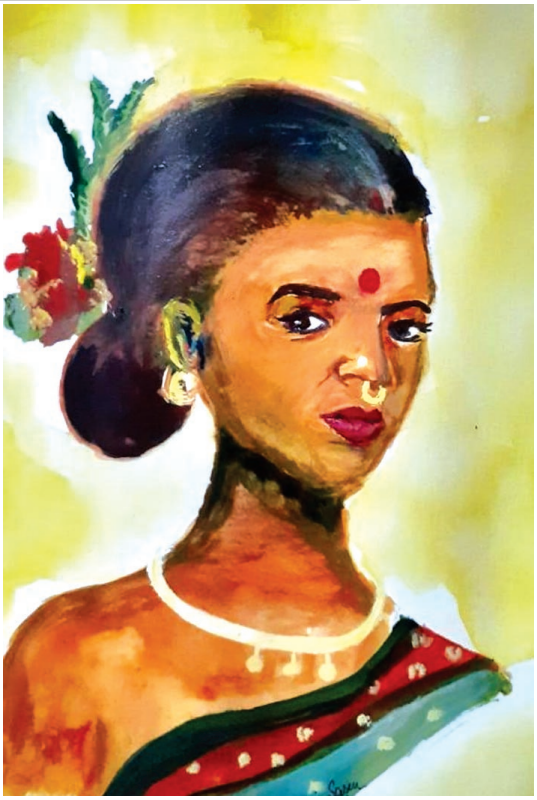

জনজাতি সমাজে সাঁওতাল নারী-জাগরণ

মৌসুমী সরেন

প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত, নিজস্ব রীতিনীতির উপর নির্ভরশীল, আপন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, স্ববিচার-ব্যবস্থার ওপর আস্থাশীল যে সমাজবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম অধিবাসী তারাই হলেন জনজাতি। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাধারণত সমাজে একত্রিতভাবে বসবাস করতে ভালোবাসে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। সাঁওতাল বা সান্তাড়ি হলো এমন এক জাতি যারা ভারতবর্ষে বহু যুগ আগে থাকতেই বসবাস করে আসছেন। ভারতবর্ষের এরা আদিম অধিবাসী। এদের প্রধান ভাষা হলো সাঁওতালি। এই ভাষায় কথা বলতেই এরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সান্তাল বা সাঁওতালরা সাধারণত খুবই সহজ সরল, নিরীহ প্রকৃতির ও শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকে। দৃঢ়চেতা, স্বাধীন, সহনশীল মানসিকতাসম্পন্ন সাঁওতাল সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। আজও কোনও পরিবারে কন্যাসন্তান জন্মলাভ করলে তাকে দু'হাত তুলে সগর্বে দীর্ঘজীবী হওয়ার আশীর্বাদ করেন গুরুজন-সহ এই সমাজের অন্যান্য মানুষেরা। তারা মহিলাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। শৈশব থেকেই সাঁওতাল রমণীরা নিজস্ব প্রচলিত ধারার সংগীত ও নৃত্যকলার সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং চর্চা করেন। পূজাপার্বণ, আচার অনুষ্ঠানে তাঁরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক পর্যায়ের সুমধুর সংগীত এবং দৃষ্টিনন্দন নৃত্য পরিবেশন করেন। সাঁওতাল মহিলারা সাধারণত তামাটে বর্ণের হয়ে থাকেন এবং কেশ ঢেউখেলানো হয়।

গ্রামীণ এলাকায় মহিলারা বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকেন। প্রধানত চাষবাসের কাজে। পুরুষের সঙ্গে মহিলারাও যৌথভাবে কাজে সহযোগিতা করেন। প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা জঙ্গল থেকে শালপাতা কুড়িয়ে থালা তৈরির কাজে যুক্ত থাকেন। বাঁশ ও বেতের বিভিন্নরকম প্রয়োজনীয়, আকর্ষণীয় বস্তু তৈরিতে শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন রাখেন। পাহাড়ি এলাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা চা-বাগানের চা-পাতা তোলার কাজও জনজাতি মহিলারা করে থাকেন। জনজাতি সমাজে গ্রামের চিত্র যদি তুলে ধরা হয় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে গ্রামের বাড়িগুলির দেওয়ালে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুন্দর, নিখুঁত লোকচিত্র আঁকা হয়েছে যা মহিলারাই নিপুণতার সঙ্গে করে থাকেন। এই সমাজের মহিলারা রুজি- রোজগারের টানে শহরে এসে বসবাস করলেও গ্রামের প্রতি টান তারা ভুলে যায়নি, তাই সময় বার করে ছুটে যায় মাটির ঘ্রাণ নিতে।

বর্তমানে জনজাতি নারীরা বিভিন্ন পেশায় নিজেদের ক্রমশ প্রকাশিত করে চলেছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এই পেশাগুলিতে সাঁওতাল মহিলারা পা রাখছেন এবং দক্ষতার সঙ্গে তা নির্বাহ করে চলেছেন। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, সামাজিক ঔদার্য তাদের বিভিন্ন কর্মে প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাঁওতাল সমাজে মহিলাদের কখনও অবাঞ্ছিত করে রাখা হয়নি। তাই তাদের মানসিকতা, ধ্যানধারণা, সুস্থ চিন্তনশীল মনোভাবাসম্পন্ন হওয়ায় কর্মজগতে নিজেদের সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারছে। লক্ষণীয় যে, আধুনিক যুগে সাঁওতাল সমাজের মহিলারা সাহিত্যচর্চায়ও নিজেদের উন্মীলিত করছে। তাদের লেখনীতে গান, কবিতা, গল্প, নাটকে বাস্তব, কাল্পনিক, ভ্রমণকেন্দ্রিক, প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়গুলি উপজীব্য হয়ে উঠছে। সাধারণের মনে যেগুলি জায়গাও করে নিতে পারছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সিনেমাজগতে প্রভূত উন্নতি হওয়াতে অনেক মহিলা এই শিল্পের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে অভিনয়ে দক্ষতা প্রকাশ করে চলেছেন।

বর্তমানে রাজনীতির অলিন্দে বহু মহিলা পা রেখেছেন। নিজস্ব জমি-জঙ্গলের অধিকার নিয়ে তারা সরব হয়েছে এবং সমগ্র জনজাতি সমাজকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাদের আন্দোলনকে আরও সুদৃঢ় করছে। সাঁওতাল মহিলারা স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাদের দেশীয় অস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাঁওতাল সমাজের মূল উপাস্য দেবতা হলেন— গাছ, সূর্য, চাঁদ, মারাংবুরু, জাহের আয়ো। পুজোর বিধি নিয়ম পালনে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

কার্যক্ষেত্রে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার প্রধান যে অন্তরায় ভাষা সেই ভাষার সমস্যা কাটিয়ে মহিলারা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন কর্মক্ষেত্রে। □

প্রদাহ সারাতে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকেই জন্ম ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহের। বাইরে থেকে কোনও প্রকারের ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস বা যে কোনও ধরনের আক্রমণ শরীরের উপরে এলে শরীরের স্বাভাবিক ইমিউন সিস্টেম জানান দেয় ইনফ্ল্যামেটরি কোষগুলিকে। শ্বেত রক্তকণিকার মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক উৎসেচকের প্রতিরোধ তৈরি হয় ও বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে শরীরে তা জানান দেয়। এই লক্ষণগুলি হলো, কোনও জায়গা ফুলে যাওয়া, লাল হয়ে যাওয়া, ব্যথা, গরম হয়ে যাওয়া বা অন্য কোনও অস্বাভাবিকতা। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহের আকারে ধরা দেয় আমাদের কাছে। ইনফ্ল্যামেশনের যন্ত্রণা অনেক সময়ে আমরা সহ্য করতে পারি না, তবে প্রাথমিকভাবে শরীরের ভালোর জন্যই তৈরি হয় ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স।

প্রদাহ নানা ধরনের

ইনফ্ল্যামেশন কখনও স্থানীয় বা তাৎক্ষণিক কারণে তৈরি হয়, যেমন, কোথাও কেটে বা ছড়ে যাওয়া, আঘাত পাওয়া ইত্যাদি। আবার ক্রনিক বা দীর্ঘকালীন ইনফ্ল্যামেশনও হতে পারে। আর্থাইটিসের ব্যথা, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমের মতো দীর্ঘকালীন ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্সও তৈরি হতে পারে শরীরে। দু'ক্ষেত্রের চিকিৎসা আলাদা। ক্রনিক ইনফ্ল্যামেশনের ক্ষেত্রে সারাজীবন ওষুধ বা স্টেরয়েডের সাহায্য নিতে হতে পারে। সেখানে অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেশনের চিকিৎসা চিরস্থায়ী নয়। সাধারণ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগসের মাধ্যমেই এর নিরাময় সম্ভব।

আবার ব্যক্তিবিশেষে ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্সের প্রকারভেদও আলাদা রকমের হয়। চিকিৎসকেরা এর কারণ অনুসন্ধান করে তবেই চিকিৎসা শুরু করে থাকেন। যেমন, ওবেসিটি থাকলে সেইসব রোগীর ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স খুব দ্রুত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গ চলে আসে জীবনযাত্রা ও খাওয়াদাওয়ার অভ্যেসের। মেনোপজ হয়ে গিয়েছে এমন মহিলার পা ফোলা বা ব্যথায় যত দ্রুত আক্রান্ত হবেন, একজন বছর কুড়ির তরুণী তা হবেন না। কারণ, মেনোপজের পরে সেই মধ্যবয়স্কার শরীরে হরমোনের স্বাভাবিক মাত্রা কমে যাওয়ায় ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্সের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'চিরস্থায়ী ভাবে

ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স বন্ধ করে দেওয়ার ওষুধ দেওয়া হয় না। লোকাল বা সিস্টেমেটিক ভাবে এর চিকিৎসা হয়। ইনফ্ল্যামেশন শরীরে এক ধরনের অটো-ইমিউন রেসপন্স তৈরি করে, যা শরীরের জন্য দরকারি।'

কেন হয় এই প্রদাহ?

কোনও অর্গ্যানের বিরুদ্ধে যখন শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে তখন ধীরে ধীরে সেই অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। শরীরের অটোইমিউন রেসপন্সের মাধ্যমেই এমনটা হয়। ইনফ্ল্যামেশনের প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় রাসায়নিক চেন। ক্যাপিলারি পারমিয়েবিলিটি বেড়ে যায়। প্লাজমা, প্রোটিন বেরিয়ে আসে ও ফ্লুরিড জমে জায়গাটি ফুলে যায়, ব্যথা করে। শ্বেত রক্তকণিকা তখন আইএলসিক্স (ইন্টারলিউকেন সিক্স) কেমিক্যাল তৈরি করে এবং ইনফ্ল্যামেটরি চেনটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগের প্রয়োগে এই চেনটিই ভাঙার চেষ্টা করা হয়।

চিকিৎসার নানা রূপ

সাধারণত ইনফ্ল্যামেশনের প্রাথমিক চিকিৎসার নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ (এনএসএআইডি)-এর ব্যবহার দেখা যায়। এটির প্রয়োগে সেই অর্গ্যানের ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স বন্ধ হয়ে যায়। প্যারাসিটামল যেমন খুব চেনা একটি অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ। আবার ক্ষেত্রবিশেষে নানা সাপ্লিমেন্ট দিয়েও ইনফ্ল্যামেশনের চিকিৎসা চলে। তবে সেগুলি মূলত প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা। কোনও ক্রনিক ডিক্লিজের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই স্টেরয়েডের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। হয়তো দেখা গেল, স্টেরয়েডের সাহায্য নিয়ে ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহ বন্ধ হলেও রোগীর সুগার বেড়ে যাচ্ছে। তাই স্টেরয়েডের প্রয়োগ দরকার হলে, সবদিক বিচার করে তবেই নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা।

মনে রাখতে হবে, প্রতিটি অর্গানের ক্ষেত্রে ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স আলাদা। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসও এক ধরনের অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স। এক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াসের বিটা সেলের বিরুদ্ধে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করতে শুরু করে ও সেলগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ইনসুলিন তৈরি হওয়ায় বাধা পড়ে। ডায়াবেটিসের সূত্রপাত সেখান থেকেই। আবার আথ্রাইটিসের ক্ষেত্রে কার্টিলেজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেখানে কতকগুলি ইনফ্ল্যামেটরি কেমিক্যাল তৈরি হয়। শরীরে এই রাসায়নিকের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেলে একটা সময়ের পরে আর নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় না। তখন স্টেরয়েডের সাহায্য নিতে হয়।

বাহ্যিক চোট-আঘাত ও প্রদাহ

কোল্ড কমপ্রেস বা ঠাণ্ডা সেঁকের ফলে ব্লাড ভেসেলগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ফলে বেশি ফ্লুয়িড সার্কুলেশন হতে পারে না এবং ব্যথা ও ফোলা ভাব কমতে থাকে।

ইনফ্ল্যামেশনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতন থাকলে ও ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায় যে কোনও অসুখ। তাই কোনও ধরনের প্রদাহই অবহেলা করবেন না। প্রদাহের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা খুবই ফলপ্রসু।□

সিংহ অহিংস হলে আর সিংহ থাকে না

অনঙ্গদেব মিত্র

নরেন্দ্র মোদী একবার বলেছিলেন, 'হাম আঁখ উঠাকে নেহী বাত করেঙ্গে। হাম আঁখ ঝুকাকে বাত নেহী করেঙ্গে। হাম আঁখ মিলাকে বাত করেঙ্গে।' অর্থাৎ আমরা চোখ পাকিয়ে কথা বলব না। চোখ নামিয়েও কথা বলব না। আমরা চোখে চোখ রেখে কথা বলব।

এই কথার মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আজকের ভারতের অ্যাটিটিউড একেবারে অন্যরকম। আজকের ভারত যেমন অতিমারির সময় প্রতিবেশী দেশকে ভ্যাকসিন পাঠায়, দেউলিয়া শ্রীলঙ্কাকে খাবার, ওষুধ ও পেট্রোল দিয়ে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপের কাছে মাথা নত না করে নিরপেক্ষ অবস্থানও নিতে পারে। এমনকী আমেরিকার দাদাগিরি উড়িয়ে দিতেও ভারতের বুক আজকাল ভয়ে কাঁপে না। একেই বলে অ্যাটিটিউড। নতুন সংসদ ভবনে অশোক স্তম্ভের যে এমব্লেম বসানো হয়েছে তার মুখব্যাদানরত সিংহ এই অ্যাটিটিউডের সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। ভারতীয়রা যে আর কোনওভাবেই আত্মসম্মানের সঙ্গে আপোশ করতে রাজি নন, জাতীয় প্রতীকে সিংহের সিংহত্ব প্রাপ্তি তারই প্রমাণ। কিন্তু ভারতের বিরোধী দল ও তার নেতারা কি এই কথা মানেন? আজ্ঞে না। নরেন্দ্র মোদী কিছু বললে বা কিছু করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদে নেমে পড়েন। প্রতিবাদটি যুক্তিসঙ্গত নাকি অযৌক্তিক তাও তাঁরা ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। কয়েকজনের প্রতিবাদের ধরনধারণ একটু দেখে নিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

প্রতিবাদ নং ১

তৃণমূল কংগ্রেসের কথাই ধরা যাক। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'আগের সিংহ ছিল মর্যাদা ও শান্তির প্রতীক। নতুন সিংহ ভয়ংকর। কেন্দ্রীয় সরকারের (পড়ুন মোদীর) মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে নতুন সিংহের মূর্তিতে।' তৃণমূলের রাজ্যসভা সদস্য শান্তনু সেন বলেছেন, 'বলা হয় ভারত সব ধর্মের মানুষের দেশ। এই অশোক স্তম্ভ উদ্বোধনের পর দেশে আর পুজোপাঠের প্রয়োজন রইল না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিরোধীদের ডাকা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় দেশে বিরোধীদের কোনও জায়গা নেই।' পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বলেছেন, 'নতুন সিংহ জাতীয় প্রতীকের অপমান।' তৃণমূলের আর এক সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেছেন, 'এই সিংহ সারনাথের সিংহ নয়।'

মুশকিল হলো, পশ্চিমবঙ্গে রামধনু রংধনু হয়ে যায়। ছোটোদের ইতিহাসের

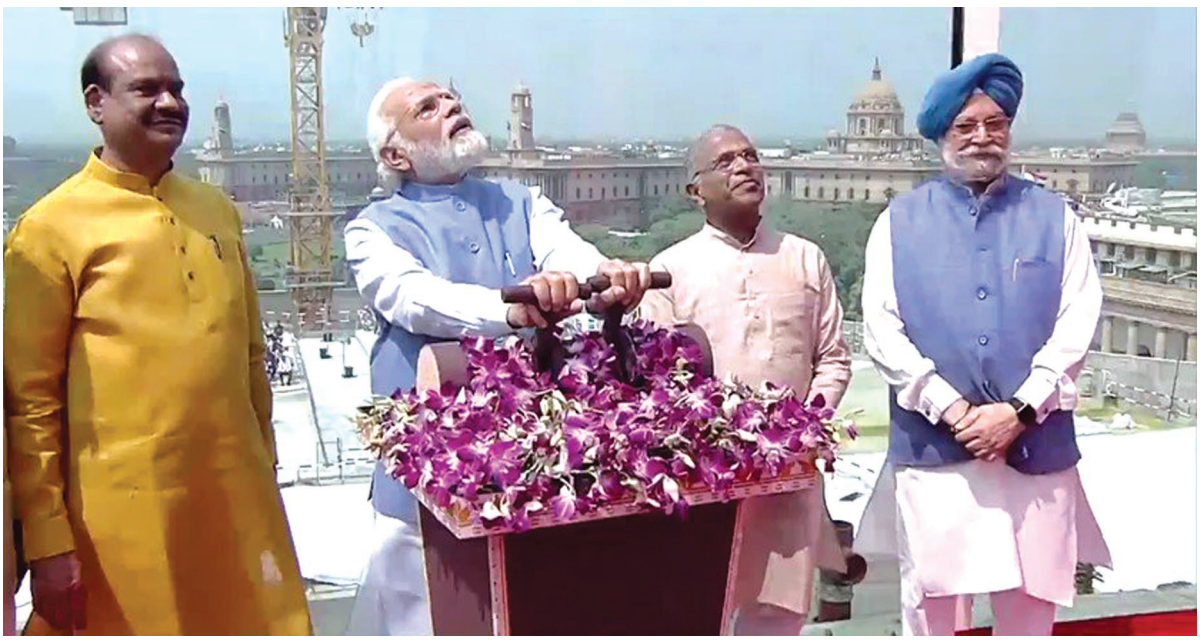

রাজনীতিতে কমেডি

ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা অনেকবার সাধারণ মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। সংসদে, মিডিয়ায়, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে বেলাগাম ঢক্কানিনাদের পর পর্বতের মুষিক প্রসব দেখে খুব হেসেছি আমরা। সেরকমই কয়েকটা ঘটনা :

রাহুল গান্ধীর লাল ডায়েরি

এই সেই লাল ডায়েরি যেখানে নরেন্দ্র মোদীর সব 'দুর্নীতি'র রেকর্ড আছে বলে দাবি করেছিলেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যখন লাল ডায়েরি দেখতে চাইল তখন আর তা খুঁজে পাওয়া গেল না।

রাফাল চুক্তিতে বেআইনি লেনদেন

এখানেও রাহুল গান্ধী। রাফাল চুক্তিতে বেআইনি লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। স্লোগান দিয়েছিলেন, চৌকিদার চোর হ্যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট চুক্তিতে বেআইনি কিছু পায়নি।

সার্জিকাল স্ট্রাইকের প্রমাণ

ভারত পাকিস্তানে সার্জিকাল স্ট্রাইক করল। সেনাবাহিনীর প্রধান এই খবর দিলেন। কিন্তু রাহুল, মমতা, অখিলেশ-সহ প্রায় সব বিরোধী নেতা বললেন, আমরা মানি না। সার্জিকাল স্ট্রাইকের প্রমাণ দেখাও। প্রমাণও দেখানো হলো। এখন সব চুপচাপ।

বিজেপির ভ্যাকসিন নেব না

এই কথা বলেছিলেন অখিলেশ যাদব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ভারতের ভ্যাকসিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। অনেকটা একই কথা বলেছেন মুসলমান মৌলবিদের একাংশ। তাদের দাবি, বিজেপির ভ্যাকসিন নিলে মুসলমানদের যৌন ক্ষমতা কমে যাবে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ভারতে প্রথম, দ্বিতীয় ও বুস্টার ডোজ নিয়েছেন ২০০ কোটি মানুষ।

অগ্নিপথ প্রকল্পে প্রার্থীদের জাত জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে

এবার তেজস্বী যাদব। তিনি অগ্নিপথ প্রকল্পের ফর্মে জাত লেখা কলামটি দেখিয়ে অভিযোগ করেছেন জাতপাতের ভিত্তিতে লোক নেওয়া হচ্ছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ জানিয়ে দিয়েছেন এই রীতি ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে। বিন্দুমাত্র হোমওয়ার্ক না করে মন্তব্য করলে এরকমই হয়।

পাঠ্যবইতে সিঙ্গুর আন্দোলন ঢুকে পড়ে। আগডুম-বাগডুম কবিতা লিখে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার পান। রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে লেবুর রস খাইয়ে গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ করেন। বিষ্ণুদেবতা বিষ্ণুমাতা হয়ে যান। এইসব যুগান্তকারী ঘটনায় মহুয়া মৈত্রেরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন কিন্তু একদা 'ভেজিটেরিয়ান' সিংহ নিজের জাতধর্ম ফিরে পেলে একেবারে রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বোকার মতো 'পুজোপাঠ বন্ধ হয়ে' যাবার অপ্রাসঙ্গিক গল্প ফাঁদেন। এমনকী সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গও টেনে আনেন। এদের কাছে জানতে ইচ্ছে হয়, আর কতভাবে আপনারা পশ্চিমবঙ্গকে অপমান করবেন? আজকাল এসব কথায় সাধারণ মানুষ হাসির খোরাক পায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সারা দেশ থেকে আছড়ে পড়ে তৃণমূল নেতাদের নিয়ে রসিকতা। অপমানিত হয় বাঙ্গালি।

প্রতিবাদ নং ২

কংগ্রেসের নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি বলেছেন, 'অশোক স্তম্ভের চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হয়েছে। এটা ভারতের জাতীয় প্রতীকের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়।' আসাদুদ্দিন ওয়েসিও সিংহ বদলে গেছে বলে তোপ দেগেছেন। কিন্তু এরা যতই বদলে যাওয়ার গল্প বলুন, সত্যিই কি কিছু বদলেছে? বাড়ির ঠাকুরঘরে পূজিত দুর্গাপ্রতিমা আর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপে পূজিত দুর্গাপ্রতিমা কি আকারে এক? একটি ছোটো আকৃতির মূর্তিকে যখন বড়ো করে গড়া হয় তখন তা হয়ে ওঠে অনেক বেশি জীবন্ত। এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে যা ছোটো আকৃতির মূর্তিতে ধরাই পড়েনি। এমনটাই ঘটেছে সিংহের ক্ষেত্রে। সারনাথে সম্রাট অশোকের অপেক্ষাকৃত ছোটো আকৃতির সিংহকে অনেক বড়ো করে তৈরি করানো হয়েছে। আর তাতেই বদলে গেছে সিংহের অ্যাটিটিউড। কেন্দ্রের নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরীর কথায় উঠে এসেছে এই তথ্য। কিন্তু বিরোধীরা কেন সেটা বুঝলেন না? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজেপির মুখপাত্র অনিল বালুনি বলেছেন, 'বিরোধীরা সবসময় প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন। এটা দেশে অস্থিরতার সৃষ্টি ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।'

উদ্বোধন

নতুন সংসদ ভবনের ছাদে সাড়ে ছয় মিটার লম্বা অশোক স্তম্ভের উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী-সহ আরও অনেকে। অশোক স্তম্ভ আগাগোড়া ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি, এর ওজন ৯ হাজার ৫০০ কেজি। সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের এক

আধিকারিক এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান, সংসদ ভবনের ছাদের ঠিক মাঝখানে অশোক স্তম্ভ বসানো হয়েছে। স্তম্ভকে ধরে আছে ৬ হাজার ৫০০ কেজি ওজনের ইস্পাত নির্মিত কাঠামো। সংসদ ভবনের নির্মাণ কর্মীদের সঙ্গে এদিন কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। স্তম্ভের প্রাথমিক স্কেচ তৈরি থেকে শুরু করে কাস্টিং পর্যন্ত বিরাট কর্মকাণ্ডের আটটি আলাদা-আলাদা স্তর আছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্লে মডেলিং, কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ব্রোঞ্জ কাস্টিং ও পলিশিং। অশোক স্তম্ভকে ১৫০টি অংশে ভাগ করে ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর প্রতিটি অংশ জুড়ে মূল স্তম্ভ খাড়া করা হয়। এপ্রিলের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল স্তম্ভ নির্মাণের কাজ। মোটামুটি দু'মাসে শেষ হয়েছে পুরো কাজ।

উপসংহার

ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা অ্যান্টি মোদী গ্যাঙে রূপান্তরিত হয়েছেন। এদের নিজেদের কোনও কর্মসূচি নেই। সারাক্ষণ শুধু নরেন্দ্র মোদীকে কীভাবে অপমান করা যায় সেই কথা ভাবেন। উত্তরপ্রদেশে লুলু মলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ নমাজ পড়লে এরা কিছু বলেন না, পিএফআই ২০৪৭-র মধ্যে ভারতকে ইসলামিক দেশ বানানোর ষড়যন্ত্র করলে মুখে কুলুপ আঁটেন, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি দেশ থেকে পালিয়ে গেলে 'এবার মোদীর পালা' বলে টুইট করেন, কিন্তু সিংহের দাঁত দেখা গেলে হঠাৎ দেশভক্ত হয়ে ওঠেন। এদের দেশভক্তি যে আসলে নরেন্দ্র মোদীকে কোণঠাসা করার জন্য সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। নরেন্দ্র মোদীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে দেয় তিনি যা করছেন দেশের ভালোর জন্যেই করছেন। কিন্তু এইসব নেতারা যা করছেন তা কীসের জন্য করছেন, একটু বুঝিয়ে বলবেন কি? আপনাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী রাজনীতি এরকম নির্বোধ হলে সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তাই অনুরোধ, এবার থেকে মন্তব্য করার সময় ভাবুন। ভাবা প্র্যাকটিস করুন। আপনারা ভাবতে শিখলে বাঙ্গালিকে নিয়ে হাসাহাসি হয়তো কিছুটা কমবে।

অশোক স্তম্ভ তৈরি করে গর্বিত সুনীল

মহারাষ্ট্রের শম্ভাজীনগরের ৪৯ বছর বয়েসি ভাস্কর সুনীল দেওরে তৈরি করেছেন নতুন অশোক স্তম্ভ। সুনীল দেওরে জে জে স্কুল অব আর্টসের গোল্ড মেডেলিস্ট। ইতিমধ্যেই একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মানে তিনি সম্মানিত। সুনীলের বাবাও একই স্কুলের ছাত্র। ভারতের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের অংশীদার হতে পেরে তিনি গর্বিত। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'সারা দেশের অসংখ্য শিল্পীর মধ্যে থেকে এই কাজ করার জন্য আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এর জন্য আমি গর্বিত। কারণ নতুন সংসদ ভবন ও অশোক স্তম্ভের কথা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' সুনীল দেওরে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। তাঁর বাবা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রেস্টোরেশন বিভাগের কর্মী ছিলেন। এর আগে সুনীল অজন্তা ও ইলোরার মূর্তি ও চিত্রের রেপ্লিকা তৈরি করেছেন। মূল গুহার ওপর চাপ কমানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সুনীল জানিয়েছেন অশোক স্তম্ভ নির্মাণের বরাত পেয়েছিল টাটা প্রোজেক্ট লিমিটেড। স্তম্ভ নির্মাণের যোগ্যতা যাচাই করার উদ্দেশে টাটা প্রোজেক্ট সারা দেশ জুড়ে সমীক্ষা করে। অনেক ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর সুনীল নির্বাচিত হন। সুনীল প্রথমে স্তম্ভের ক্লে মডেল বানান। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের আধিকারিকেরা সুনীলের মডেল অনুমোদন করার পর পরের কাজ এগোয়। সুনীল বলেন, 'ক্লিয়ারেন্স পাবার পর আমি ফাইবারের মডেল তৈরি করেছি। তারপর সেটা নিয়ে জয়পুরে যাই। ওখানেই ব্রোঞ্জ কাস্টিং হয়।'

সিংহনাদে অবস্থান স্পষ্ট করছে নতুন ভারত

নিখিল চিত্রকর

দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্কের ঢেউ। যাকে কেন্দ্র করে এই নতুন রাজনৈতিক তরজা, তা ভারতের জাতীয় প্রতীক 'অশোক স্তম্ভ'। এদেশের বিরোধী তথা সেকুলারপন্থীরা সরব হয়েছে এই বলে যে নতুন সংসদ ভবনের মাথায় জাতীয় প্রতীক হিসেবে ৯৫০০ কেজি ব্রোঞ্জের যে অশোকস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে তার সিংহরা আগের তুলনায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। তাদের ক্ষুরধান ক্যানাইন স্পষ্ট। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর আমলের সিংহগুলি আগের মতো ঠিক নিরীহ গোছের নয়। আসলে সেন্ট্রাল ভিস্টার মাথায় তৈরি অশোকস্তম্ভের সিংহগুলির শারীরিক পরিভাষা জানান দেয়, তারা আর শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় বিশ্বাসী নয়, তারা পালটা মারও দিতে পারে। লেখা প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, আদিত্য ধর পরিচালিত ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' ছবিটির কথা। সেখানে পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদীদের ডেরা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর পরেশ রাওয়াল অভিনীত গোবিন্দ্ নামের চরিত্রটি বলেন, 'ইয়ে নয়া হিন্দুস্তান হ্যায়, ইয়ে ঘর মে ঘুষেগা ভি, অউর মারেগা ভি।' অর্থাৎ এটা নতুন ভারত। এই ভারত ঘরে ঢুকবে (পড়ুন পাকিস্তান) এবং মারবে। চলচ্চিত্রের সংলাপের মর্মার্থ যখন বাস্তবে ভারতের জাতীয় প্রতীকে দণ্ডায়মান সিংহের আকৃতিতে ফুটে উঠছে তা মেনে নিতে বোধহয় অসুবিধেয় পড়ছেন এদেশের সেকুলারজীবীরা। তাই তাঁরা বিরোধিতা করছেন। সমাজমাধ্যমে টুইট করছেন। মিডিয়ায় বাইট দিচ্ছেন। তাঁরা হতাশা প্রকাশ করছেন এই বলে যে— এই সিংহের প্রতীকে কোথাও শান্তির বাণী ফুটে উঠছে না।

ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসেবে প্রচলিত অশোকস্তম্ভের চারটি সিংহ শক্তি, সাহস, গর্ব ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। সিংহের মধ্যে শৌর্যবীর্য ও তেজ থাকার কারণেই তাঁকে নানা শিশুপাঠ্য কাহিনিতে জঙ্গলের রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের দুবার ভাবতে হয় না। তাই সঙ্গত কারণেই উত্তরপ্রদেশের সারনাথের অশোকস্তম্ভের

আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীককে। ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট অশোকের শাসনকালে অশোকস্তম্ভের মাথায় এই চতুর্মুখী সিংহকে স্থাপন করা হয়। মৌর্যযুগে সিংহ ছিল রাজশক্তির প্রতীক। সেই সময়ে মনে করা হতো, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে রাজাধিরাজ তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। তারই প্রতীক সিংহ। স্বাধীনতা পরবর্তী আধুনিক ভারতে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা মাথায় রেখেই ওই সিংহ নির্বাচন করা হয়েছিল। ১৯৫০ সাল থেকে এই ভাস্কর্যের রৈখিক প্রতিরূপ ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯০৪ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ফ্রেডরিখ অস্কার ইমানুয়েল ওয়ের্টেল সারনাথ অঞ্চলে খননের সময় খুঁজে পান গুপ্ত যুগের একটি মন্দির। কিছু পরে সেখানেই অশোকস্তম্ভের স্থাপত্যটির দেখা মেলে। সাঁচিতেও একরকম একটি ভাস্কর্য উদ্ধার হয়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে সারনাথের স্থাপত্যটি অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী কলিঙ্গ যুদ্ধের পরিণতি সম্রাট অশোকের জীবনে বড়ো পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। তিনি চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। তার অব্যবহিত পরেই তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে মনোনিবেশ করেন। সেই প্রচেষ্টা স্বরূপ দেশেবিদেশে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করতেই তিনি তার নামাঙ্কিত স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে মত ঐতিহাসিকদের।

অশোকস্তম্ভের মাথায় চারটি সিংহ একে অপরের দিকে পিঠ দিয়ে চারদিকে মুখ করে বসে রয়েছে। চারটে সিংহ যে বেলনাকার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে সেখানে একটি হাতি, একটি ঘোড়া, একটি ষাঁড় ও একটি সিংহের মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। বহু ঐতিহাসিকের মতে, এই চারটি পশু বুদ্ধের জীবনের চার অধ্যায়ের প্রতীক। আবার কারও মতে এরা অশোকের আমলে পৃথিবীর চারটি অংশকেই বোঝাচ্ছে। চারটে পশুর নির্দিষ্ট ব্যবধানের মাঝখানে রয়েছে একটা করে ধর্মচক্র। প্রতিটি চক্রে ২৪টি করে শলাকা রয়েছে। একেবারে গোড়ায় দেবনাগরী হরফে লেখা 'সত্যমেব জয়তে'। জাতীয় প্রতীকের বহুল ব্যবহৃত দ্বিমাত্রিক রূপে একটা চক্রই দেখা যায়। যার একদিকে ষাঁড় ও অন্যদিকে রয়েছে একটি ঘোড়া।

স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের সংবিধানের নকশা বা অনুলিপির দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুকে। নন্দলাল বসু চেয়েছিলেন এই চার সিংহের মূর্তি ভারতকে শৌর্যবীর্য, দৃঢ়তা ও পরাক্রমের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরবে। আমরা অশোকস্তম্ভের যে এমব্লেম দেখি তা অনেকটা ছোটো আকারের এবং রৈখিক। সেক্ষেত্রে সিংহের প্রকৃত বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আজ অবধি তেমন ভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়েনি। তাছাড়া একটা দেশের জাতীয় প্রতীক হয়ে উঠেছে যে সিংহ আর যাই হোক সে নখ-দন্তবিহীন হবে না নিশ্চয়ই। মূল সমস্যাটা তৈরি হয়েছে আসলে নতুন সংসদভবনের উপর নির্মিত অশোকস্তম্ভের বিশাল আকৃতির জন্য। এর ফলে অনেক ছোটো ছোটো ডিটেলস চেখে পড়ছে। তাই মনে হচ্ছে এটা সারনাথের মূল স্তম্ভ থেকে আলাদা। অনুপাত ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের কারণেই এমন বিভ্রম তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করেছেন স্তম্ভের নির্মাণ শিল্পীরা। সেসব বাদ দিলে মূল স্তম্ভের সঙ্গে নতুন স্তম্ভটির মিল রয়েছে ৯৯ শতাংশ।

ইসু যাই হোক, মোদী বিরোধিতার পালে নতুন করে হাওয়া লেগেছে যখন, এ সুযোগ ছাড়তে নারাজ সেকুলারজীবীরা। তারা সেই দেখতে নিরীহ সিংহকেই ফিরে পেতে চাইছেন। আসলে নতুন ভারতের উত্তরণে প্রমাদ গুনছেন সেইসব ধামাধারীরা যারা দেশকে পিছনের সারিতে দেখতেই চির অভ্যস্ত। সংকীর্ণ রাজনীতির গণ্ডির মধ্যেই যাদের উত্থান-পতন সীমাবদ্ধ, তারা গর্জনমুখী সিংহের উত্থান মেনে নেবে না, এটাই স্বাভাবিক। ■

শ্রীলঙ্কার পতাকায় তলোয়ার হাতে মুখব্যাদানরত সিংহ

৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীলঙ্কা জয় করে শ্রীলঙ্কার প্রথম রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন সম্রাট বিজয়। তিনি সেইসময়ে সিংহখচিত একটি পতাকা হাতে নিয়ে শ্রীলঙ্কায় পা রাখেন। সেই সিংহখচিত পতাকাই পরবর্তীকালে শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকার স্বীকৃতি পায়। শ্রীলঙ্কার পতাকার গেরুয়া অংশ হিন্দুধর্মকে বোঝায়। মেরুন রং শ্রীলঙ্কার সিংহলী সম্প্রদায়কে বোঝায়। চার পাশের সোনালি রঙের বর্ডার বৌদ্ধধর্মের প্রতীক। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম শ্রীলঙ্কার অন্যান্য ধর্মকে ঢাল হিসেবে রক্ষা করছে। সিংহের চারপাশে সোনালি রঙের চারটি অশ্বত্থের পাতা বৌদ্ধধর্মের চারটি মৌলিক প্রতীক— প্রেম, সমবেদনা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মনিয়ন্ত্রণকে ইঙ্গিত করছে। শ্রীলঙ্কায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম হলো বৌদ্ধধর্ম। শান্তি ও মৈত্রীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত দ্বীপরাষ্ট্রের পতাকায় খোলা মুখের একটি সিংহ বিদ্যমান। তার হাতে তলোয়ার। সিংহলীদের মতে এটি দেশটির সার্বভৌমত্বের ইঙ্গিতবাহী। আর সিংহ হলো শক্তির প্রতীক। সিংহের হাতে থাকা তলোয়ারটি জল, আগুন ও বায়ুর মতো উপাদানকে বোঝায়, যা দিয়ে এই দ্বীপরাষ্ট্রটি গঠিত।

ছবি কথা

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন কোনো নতুন ঘটনা নয়। জেহাদি ও মোল্লাবাদীরা নানান ছলছুতোয় হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা। এর সাম্প্রতিক সংযোজন হলো নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায়। আকাশ সাহা নামে এক পড়ুয়ার নামে ফেক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে তা থেকে নবী মুহম্মদকে অপমান করার অজুহাতে সেখানে হিন্দুদের মারধর, বাড়িঘর, দোকানপাট ও মন্দিরে লুঠতরাজ, ভাঙচুর ও আগুন লাগানো হয়। সেখানকার হিন্দুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন দীপালি সাহা। দুধের শিশু নাতনিটি অবাক বিস্ময়ে হয়তো-বা ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞাসু নয়নে ভাবছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভরপুর এই বাংলাদেশে আমার ভবিষ্যৎ কী? ছবিটি বাংলাদেশের নড়াইলের সাহাপাড়ার। দীপালি সাহা (৬২) এবং নাতনি রাই সাহা (৮ মাস)। গত ১৬ জুলাই দুপুরে নিজের চোখের সামনে নিজের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেছেন।

বলে

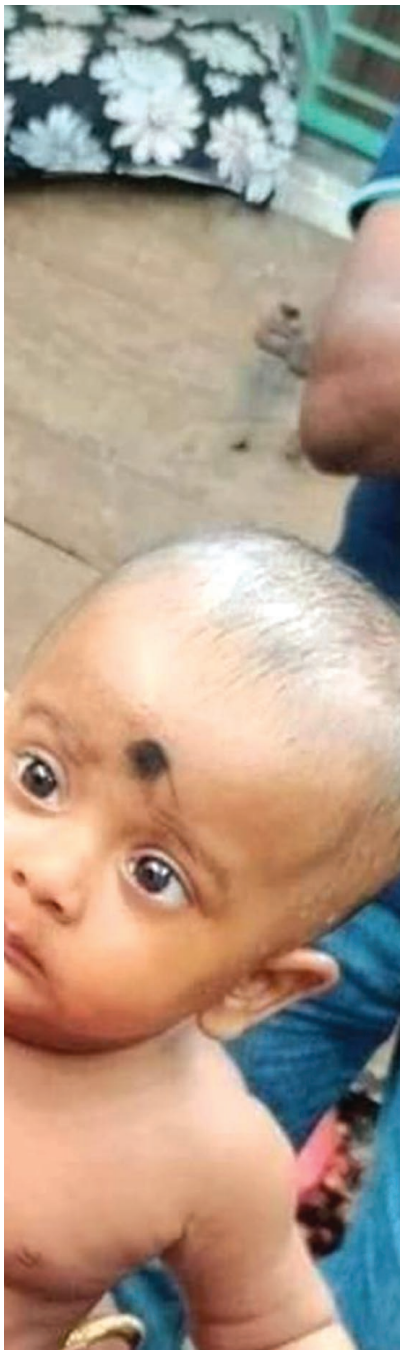

ডেইলি স্টারকে তিনি বলেন, ‘ একদল লুঠ করে চলে যাবার পর আরেক দল লুঠ করতে এসে কিছু না পেয়ে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে।’

অভিযুক্ত শিক্ষার্থী যুবক আকাশ সাহাকে বেশ কয়েকজন পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। তার হাতে হাতকড়া, দুই পুলিশ তাঁর দুই হাত ধরে রেখেছে। তাঁর অপরাধ তিনি নাকি ফেসবুকে নবী মুহম্মদের বিরুদ্ধে লিখেছেন। যদিও ইতিমধ্যে খবর বেরিয়েছে যে আকাশ এ কাজ করেনি। ইউএনও ভাষ্য মতে , ফেক আইডি বানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম নামে একজন আকাশের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সেটি করেছে। এভাবেই আকাশকে ফাঁসানো হয়েছে।

সাহাপাড়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন লাগানো, মন্দির ও মূর্তি ভাঙচুর, লুঠতরাজ ও মারধর করার অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজন দুষ্কৃতি। সঙ্গে মাত্র দুজন পুলিশ। অপরাধীদের কারও হাতে হাতকড়া নেই, যেন তারা শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সত্যিই বাংলাদেশে হিন্দুরা জামাই আদরে আছে! প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত বাংলাদেশের হিন্দুরা তাই বলছে, ভারতের মুসলমানরা আমাদের মতো জামাই আদরে কেন থাকে না! পাশাপাশি দুটি ছবি প্রমাণ করে দিচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা।

শ্রীগুরু পূর্ণিমায় সুরকার ও গীতিকার মানস চক্রবর্তীকে সম্মাননা সংস্কার ভারতীর

শ্রীগুরু পূর্ণিমা তিথিতে সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখা প্রতি বছর নটরাজ পূজনের আয়োজন করে থাকে। এবারও নটরাজ পূজনের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অর্ঘ্য দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সংস্কার ভারতী কোনো মানুষ নয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রূপক নটরাজকেই গুরু হিসেবে বন্দনা করে। সুর-লয়-তাল-ছন্দে নটরাজের যে অবস্থান তাই ভারতীয় সংস্কৃতি। মানব কল্যাণের নিমিত্ত মানুষের অন্তর্নিহিত শুভ বোধগুলি যে শক্তির মাধ্যমে জাগ্রত হয় তাকেই সংস্কৃতি বলা হয়। জগতের আনন্দযজ্ঞে নব নব সৃষ্টির যে বাসনা তাই লাস্য। আবার জগৎ শুদ্ধিকরণে নব সৃষ্টির প্রেরণায় তিনিই প্রলয়ের কারণ। সৃষ্টির কারণেই ধ্বংস এবং ধ্বংসের মাঝেই নব নব সৃষ্টির প্রকাশ। এটাই ভারতবর্ষের চিরায়ত রূপ। তাই গুরুপূর্ণিমা তিথিতে সংস্কার ভারতী পালন করে থাকে নটরাজ বন্দনা।

সংস্কার ভারতী এই তিথিতে প্রচারের আলোর বাইরে থাকা, নীরবে সংস্কৃতির সাধনা করে যাওয়া শিল্পীদের সম্মানিত করে থাকে। নটরাজ দেব-দানব-মানব সকলের গুরু। তিনিই সর্ববিদ্যার স্রষ্টা। তাঁর নৃত্যের ছন্দে গড়ে ওঠে নব নব সৃষ্টি, আবার সূচিত হয় মহা প্রলয়। তাই সংস্কৃতির আদিগুরু নটরাজের প্রতীক হিসেবে কোনো শিল্পগুরুকে সংস্কার ভারতীর শাখায় এনে তাঁকে সম্মনানা জানানোর প্রথা বিদ্যমান। এবারে শ্রীগুরু পূর্ণিমায় সুরকার ও গীতিকার মানস চক্রবর্তীকে সম্মাননা জানালো সংস্কার ভারতী। এর আগে লোট সম্রাট হরকুমার গুপ্ত, রূপসজ্জা শিল্পী সনৎ গোস্বামী, শোলাশিল্পী প্রসাদ কাহার, আলোকশিল্পী বিশ্বনাথ বিশ্বাস, লোকসংগীত শিল্পী রতন কাহার ছাড়াও বংশীশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, পটশিল্পী, চিত্রশিল্পী প্রমুখ ১৪ জনকে সম্মাননা জানানো হয়েছে।

এবারের সম্মানিত শিল্পী যেহেতু দীর্ঘ রোগভোগের পর বাড়ি ফিরেছেন, তাই তাঁর বাড়িতেই সম্মাননার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ৬১ জন শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে সম্মাননা জানিয়ে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান করা হয়। তাঁদের বাড়িতে সংস্কার ভারতীর সদস্যরা পৌঁছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরীয়, ফুল, মিষ্টি ও উপহার দিয়ে সম্মাননা জানান।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বৈঠক

গত ২৬-২৭ জুন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যায়। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অনিমেষ মণ্ডল, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনুপম বেরা, সম্পাদক শ্রীমতী পাপিয়া মিত্র এবং ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেন।

লোকপ্রজ্ঞার জৌগ্রাম চর্চাকেন্দ্রে স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ১৭ জুলাই লোকপ্রজ্ঞার জৌগ্রাম চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, ড. শেখ আসরফ আলি, ড. জ্যোতির্ময় গোস্বামী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীকান্ত নন্দী। আবৃত্তি করে পিউ পণ্ডিত, রিমা মালিক ও স্বর্ণালি সরকার। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জি, শ্রীমতী বলাকা মিস্ত্রি, বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক তিনকড়ি দাস ও অশোক মজুমদার এবং শিশুশিল্পী সৌগত সরকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক শীতল কুমার পাল।

আদর্শ রানি—ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাই হোলকার

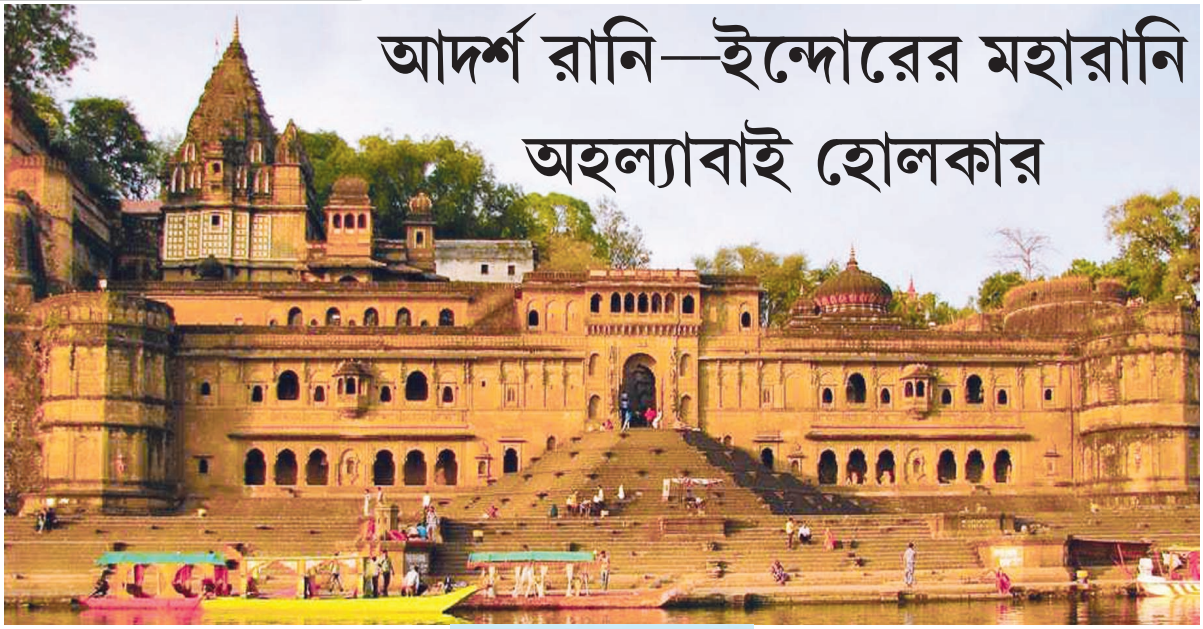

পৃথ্বীশ সেন

সমগ্র মধ্যভারতে তিনি হচ্ছেন শিবকন্যা। মহারাষ্ট্রের মালোয়া রাজ্যের বিখ্যাত হোলকার পরিবারের কুলবধূ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুবেদার মলহার রাও হোলকার ছিলেন শ্বশুরমশাই। স্বামী হলেন খাণ্ডেরাও হোলকার। মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলার ছেড়ি গ্রামে নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনে একটু আগেই আগমন ঘটেছে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর। মন্দিরে পূজা দিতে এসেছে কয়েকজন বালিকা। বাহিনীর প্রমুখ ভারতবিখ্যাত পেশোয়া প্রথম বাজিরাওয়ের সেনাপতি মলহার রাও হোলকার। মাণ্ডয়া অঞ্চল ছিল তার দায়িত্বে। মলহার রাওয়ের দৃষ্টি আটকে গেল এক বালিকার উপরে। শুধু তিনি নন তার সমস্ত বাহিনী দেখছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। নির্ভুল আর সুস্পষ্ট উচ্চারণে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে সেই বালিকা। করছে একমনে পুজো। প্রতিটি উচ্চারণে জয় করে নিচ্ছে সেই বালিকা উপস্থিত সবার মন। এরপর সেই বালিকা এলাকার গরিব বাচ্চাদের খাবার বিতরণ করতে শুরু করল। বালিকার নিবেদিত প্রাণ সেবাকাজ দেখে মনে মনে ঠিক করে নিলেন মলহার রাও তাঁর আগামী কর্তব্য। দেখা করলেন বালিকার পিতা মানকোজী রাও সিন্ধিয়ার সঙ্গে। প্রস্তাব দিলেন তার কন্যাকে তিনি পুত্রবধূ করে নিয়ে যেতে চান। মানকোজী রাও সিন্ধিয়া ছিলেন গ্রামের প্রধান। পশুপালন ছিল তাঁর পারিবারিক জীবিকা।

সেই সময়ে মেয়েদের পড়াশোনা করার কোনোরকম চল ছিল না। গ্রাম্য পরিবেশে তখন

মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ ছিল আরও নিন্দনীয়। তাবু মানকোজী রাও সিন্ধিয়া সামাজিক রীতির বাইরে গিয়ে নিজের মেয়েকে পড়াশোনা শিখিয়েছেন। শুধু পড়াশোনা নয়, সমস্ত রকমের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, সংস্কার, রীতিনীতি সবই শিখিয়েছেন তিনি মেয়েকে। গ্রামের একটি মন্দিরে শিশু অহল্যাবাই যেতেন হামেশাই। পুজো পাঠের পাশাপাশি ভোগ নিবেদন, বিতরণ সমস্ত কাজ করতেন যত্ন সহকারে।

অবশেষে এক শুভ দিন দেখে বিবাহ হলো অহল্যাবাইয়ের সঙ্গে খাণ্ডেরাও হোলকারের। অহল্যাবাই সিন্ধিয়া থেকে তিনি হলেন অহল্যাবাই হোলকার। সালটা ১৭৩৫। অবশেষে দশ বছর বিবাহিত জীবনের পরে তিনি জন্ম দিলেন এক পুত্র সন্তানের। নাম মালেরাও হোলকার। তিন বছর পর জন্ম দিলেন এক কন্যা সন্তানের, নাম মুক্তাবাই হোলকার।

কিন্তু এই সুখের দাম্পত্য জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কুমেরের যুদ্ধে নিহত হন খাণ্ডেরাও হোলকার। কুমের দুর্গের দখল নিতে আসে মুঘল বাহিনী। বিরোধিতা করেন মলহার রাও হোলকার। যুদ্ধে কামানের গোলার আঘাতে খাণ্ডেরাও মারা যান। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হন অহল্যাবাই।

স্বামীর ক্ষতবিক্ষত দেহ আনা হয় শেষ কৃত্যের জন্য। সহমরণে যেতে চান অহল্যাবাই। সেই অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করে তিনি চলে আসেন শ্মশান ঘাটে। স্বামীর চিতায় ওঠার আগে শ্বশুরমশাই মলহার রাও হোলকার প্রথমে তাকে থামানোর চেষ্টা করেন। এরপরে কুল পুরোহিত ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা মিলে অহল্যাবাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, তার ছেলে-মেয়েরা খুব ছোটো। এই সময়ে তাদের প্রয়োজন তাদের মাকে। পিতা তো নিহত। মাও যদি চলে যান, বাচ্চাদের হবে কী। অতএব নিজের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেন অহল্যাবাই।

বাচ্চাদের দেখভালের কাজে মন দেন তিনি। বৃদ্ধ শ্বশুর তার কন্যাসমা পুত্রবধূকে রাজ্যের সব কাজ শেখাতে থাকেন হাতে ধরে। বিভিন্ন দেওয়ানি কাজে তিনি নিয়ে যেতে থাকেন পুত্রবধূকে সঙ্গে করে। বুদ্ধিমতী অহল্যাবাই খুব দ্রুত শিখতে থাকেন। শ্বশুরের সঙ্গে রাজকার্য সামলাতে থাকেন।

কেটে যায় আরও বারোটি বছর। অবশেষে ১৭৬১ সালের পানিপথের যুদ্ধে দেহত্যাগ করেন পিতৃসম শ্বশুরমশাই। একে একে স্বামী শ্বশুর সব হারিয়ে ফেললেন। পুত্র নাবালক। রাজ্য হলো অভিভাবকহীন। তবু ভেঙে পড়লেন না অহল্যাবাই, নিয়ে নিলেন তার আগামী সিদ্ধান্ত। তিনি পেশোয়ার কাছে চাইলেন অনুমতি। চাইলেন মাণ্ডুয়া রাজ্যের ক্ষমতা। পেশোয়া দিলেন অনুমতি। অবশেষে ১৭৬৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি ঘোষিত হলেন রানি। রানি হলেন অহল্যাবাই হোলকার।

রানি হলেও তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। অলংকার খুব একটা পরিধান করতেন না। শাড়িও পরতেন খুব সাধারণ মানের। সাজগোজের বালাই ছিল না। বেশিরভাগ নিজের কাজ তিনি নিজেই করতেন। এমনকী তিনি কোষাগারের অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন না। তার পরিবারের কিছু জমি ছিল। সেই জমির থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনি নিজের দিন গুজরানে ব্যবহার করতেন। প্রজাপালক, প্রজা দরদি হিসেবে খুব শীঘ্রই জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। তার উৎসাহ দেখে রাজ্যবাসী সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল।

তিনি সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন মলহার রাওয়ের দত্তক পুত্র তুকোজী রাও হোলকারকে এবং সমগ্র সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে দেন তুকোজী রাওয়ের এর হাতে। সমর্থ পুরুষদের নিয়ে শক্তিশালী করে ফেললেন সৈন্যবাহিনী। অন্য আরেকটি সৈন্যদল বানালেন মহিলাদের নিয়ে। নিয়মিত অনুশীল ও পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন তিনি তার সৈন্যবাহিনীর। মাণ্ডুয়া বাহিনীর পরাক্রমে কেউ আর মাণ্ডুয়া আক্রমণের সাহস করে না। মুঘল হানাদার বাহিনীর দল যখনই আক্রমণ করে মাণ্ডুয়া, সুবিধা করে উঠতে পারে না। প্রবল বাধা পেয়ে সৈন্য ক্ষয় করে তারা পালিয়ে বাঁচে। এরপর হানাদারের দল তার রাজ্য এড়িয়ে যেতে শুরু করল। রানি নিজে যুদ্ধে যেতেন তার প্রিয় হাতির পিঠে চেপে। তির ধনুক আর বর্শা ছিল তার প্রিয় অস্ত্র। হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ করার সময় তার সঙ্গে থাকত চারটি ধনুক। এছাড়া তিনি ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধ করতে পারতেন। তরোয়াল চালনাতেও ছিলেন পটু।

পেশোয়া যখন ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছেন। তখন সমূহ বিপদ আঁচ করে একটি চিঠি লেখেন পেশোয়াকে। চিঠিতে পরিষ্কার লেখেন তিনি— বাঘকে হারানো সম্ভব। বাঘ কাছাকাছি এলেও তাকে মেরে ফেলা সম্ভব যদি ভয় না আসে মনে। কিন্তু ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে হলে দূর থেকেই করতে হয়। একবার ভালুকের থাবার মধ্যে পড়ে গেলে ভালুক তাকে চিরে মেরে ফেলে। তাই সময় থাকতে থাকতে আঘাত করুন ইংরেজরূপী ভালুকের মুখে। কাছে আসতে দেবেন না।

মাত্র তিরিশ বছরের শাসনকালে তিনি একটি ছোটো গ্রামকে ইন্দোর শহরে রূপান্তরিত করেন। রাজ্য জুড়ে অসংখ্য দুর্গ রাস্তা মন্দির জনপদ তিনি তৈরি করে সাম্রাজ্যের সুরক্ষা মজবুত করেন। ইন্দোরকে তিনি গড়ে তুলেন সেরা বাণিজ্য নগরী হিসেবে। এরপরে ক্রমশ তিনি তার রাজধানী ইন্দোর থেকে মহেশ্বরে স্থানান্তরিত করেন। নর্মদা নদীর ধারে বিশাল দুর্গ তিনি গড়ে তোলেন। রামমন্দির, রামঘাট তিনি তৈরি করেন। ধীরে ধীরে মধ্যভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় মহেশ্বর। ওদিকে ইন্দোর বাণিজ্য নগরী হিসেবে তার ঐতিহ্য বজায় রাখে। ইন্দোর-মহেশ্বর এই দ্বৈতনগরী তাঁর সাম্রাজ্যের দ্বৈতশক্তির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

রানি অহল্যাবাই প্রতিদিন তার প্রাসাদের সামনের খোলা উঠোনে বসে শুনতেন প্রজাদের অভাব অভিযোগ। যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সেইসব সমস্যার সমাধান তিনি করে দিতেন। এছাড়াও যখনই প্রজাদের কারুর কোনো বিশেষ সমস্যা হতো অথবা কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তার উপস্থিতি দরকার হতো তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্ট করতেন।

তার সময়ে তিনি কুপ্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে অনেক আইনি সংস্কার করেন। সেই সময়ে বিধবাদের সহমরণে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া চল হয়ে উঠছিল সমাজে। অনেক সময় জোর করে চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছিল বিধবাদের। রানি অহল্যাবাই এই প্রথার বিরোধিতা করেন কড়া হাতে। শুধু তাই নয়, তিনি বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারের আইন প্রণয়ন করেন। কোনো বিধবার যদি সম্পত্তি না থাকতো অনেক সময় তার ভরণপোষণ করতে চাইতো না তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। এসব ক্ষেত্রে রানি তাদের রাজকোষ থেকে ভরণপোষণের খরচও প্রদান করতেন।

পাশাপাশি শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য উন্মুক্ত করে দেন মহেশ্বরের মহল। বিভিন্ন বিখ্যাত কবিতা সাহিত্য এই সময়ে রচিত হয়। তার সময়ের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক খুশালী রাম, সাহির, অনন্ত পাণ্ডি, মর পন্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনা কালজয়ী হয়ে রয়েছে।

সূচিশিল্পে মহেশ্বর বিশেষ দক্ষতা লাভ করে। মহেশ্বর থেকে অনতিদূরে রয়েছে বুরহানপুর শহর। এখানে রয়েছে প্রসিদ্ধ তাঁতিদের বাস। তিনি সেই তাঁতিদের মধ্যে থেকে বাছাই কয়েকজনকে মহেশ্বরে পুনর্বাসন দেন। তার বদান্যতায় নতুন শাড়ি বয়নশিল্প গঠিত হয়। নাম হয় মাহেশ্বরী শাড়ি। খুবই জনপ্রিয় হয় এই শাড়ি। এখনো পর্যন্ত এই শাড়ি জনপ্রিয়তার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে।

প্রজাহিতৈষী ছিলেন তিনি। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাস্তা বানিয়েছেন। সেই সব রাস্তার নিয়মিত সংস্কারের পাশাপাশি তিনি প্রচুর গাছ লাগিয়েছেন। কুয়ো খুঁড়ে জলের সমস্যার সমাধান করেছেন। অনেক জলাশয় খনন করিয়েছেন। গৃহহীন, গরিব এদের সবার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। সমর্থদের চাষাবাদের কাজ শিখিয়ে তাদের ফসল ফলানোর কাজে নিযুক্ত করেছেন। বনবাসী ভিল সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে তিনি সুসম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের রাজ্য সুরক্ষার কাজে লাগিয়েছেন। জঙ্গল ঘেরা মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ে তিনি তাদের জন্য বিভিন্ন ফলগাছের চাষ করে খাদ্যাভাব মিটিয়েছেন।

তিনি মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপারে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। এই ব্যাপারে তিনি নিজের সন্তানকেও রেয়াত করেননি। যদিও মালেরাও অসুস্থ ছিলেন শারীরিকভাবে, তবুও বিভিন্ন বদ অভ্যাসের শিকার হয়েছিলেন। শেষে মাত্র বাইশ বছর বয়সে মারা যান। জনশ্রুতি রয়েছে বহুবার দুর্ব্যবহার করেন মালেরাও এলাকার মহিলাদের সঙ্গে। প্রতিবার দোষী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ড ভোগ করেন তিনি। বিশেষ করে ঠাকুরদা যখন বাইরে যেতেন তখন বেপরোয়া হয়ে উঠতেন তিনি। দিন দিন অভিযোগের পাহাড় জমতে থাকে তার বিরুদ্ধে। শেষে কোনো এক মহিলাকে খুনের অভিযোগে মতান্তরে সম্ভ্রম হানির অভিযোগে রানি অহল্যাবাই তাকে

প্রাণদণ্ড দেন। মহেশ্বর দুর্গের পাশে শ্রীরাম মন্দিরের সামনে হাতি পায়ের তলায় তাকে পিষে মারা হয়। বর্তমানে সেখানে তৈরি হয়েছে মালেরাও স্মৃতি মন্দির। মন্দিরের পাশে একটি জাফরির কাজ রয়েছে। সেই জাফরির কাজের মধ্যে মালেরাওয়ের মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্য দর্শিত হয়েছে।

তিনি বহু মন্দির স্থাপন করেন। সেইসব মন্দিরে পুজোর জন্য অনেক ব্রাহ্মণ নিয়োগ করেন। কিছু কিছু মন্দিরে প্রতিদিন হাজারটা করে মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে পুজোর বিধান তিনি দিয়ে যান। সারা ভারত জুড়ে চলতে থাকে তার কাজ। উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা, হরিদ্বার, কেদারনাথ, বদ্রী নারায়ণ, অবন্তী, রামেশ্বর, জগন্নাথ পুরী, শ্রীশৈলম, ভিমাশঙ্কর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ওমকারেশ্বর, সোমনাথ, গয়া ইত্যাদি জায়গায় সমস্ত মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। নিঃশুল্ক অতিথিশালা, যাত্রীনিবাস, যাত্রীসেবা সমিতি সমেত বিভিন্ন ব্যবস্থা তিনি করেন। সমস্ত জায়গায় নদীর ধারের ঘাটগুলি পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি মন্দিরে ব্রাহ্মণ নিয়োগ সমেত পুজো অর্চনার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করেন। শুধু মন্দির নির্মাণ নয় মন্দিরের আশেপাশের রাস্তা সেতু ইত্যাদি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি অযোধ্যায় সরযূ নদীর ঘাটও পুনর্নির্মাণ করেন। গঙ্গোত্রী থেকে গয়া, বদ্রীনারায়ণ থেকে রামেশ্বরম, সোমনাথ থেকে বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ থেকে শ্রীশৈলম— বলতে গেলে তিনি সারা ভারত জুড়েই মুসলমানদের ভেঙে দেওয়া মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করেন। গয়াতে নির্মাণ করেন বিষ্ণুপাদ মন্দির। পুরীতে শ্রীরামচন্দ্র মন্দির। পারলি বৈজনাথে বৈদ্যনাথ মন্দির। রামেশ্বরমে হনুমান মন্দির। এগুলো তাঁর নির্মিত মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙে সেইস্থানে জ্ঞানবাপী মসজিদ তৈরি করে। রানি অহল্যাবাই তার পাশে নতুন করে শ্রীকাশী বিশ্বনাথ মন্দির তৈরি করেন। শুধু মন্দির তৈরি নয়, সম্পূর্ণ পুজোর ব্যবস্থা সমেত দৈনিক খরচের তিনিই ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে বারাণসীতে যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করি আমরা সেটি তাঁরই নির্মাণ। প্রাচীন কাশী মন্দিরের স্থানে এখনো রয়েছে আওরঙ্গজেবের মসজিদ। যাইহোক রানি অহল্যাবাইয়ের দৌলতে কাশী অধিপতি বিশ্বনাথ তার নতুন মন্দির পান, আওরঙ্গজেবের বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের ১১১ বছর পরে। শুধু কাশী মন্দির নয়, তিনি সংস্কার করেন দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকা ঘাট।

রানি অহল্যাবাই হোলকারের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ছে তখন ইংরেজদের মধ্যেও। তার আদর্শে, তার কর্মে, তার সংস্কারে, তার প্রজা হিতৈষী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ইংরেজরাও।

জোয়ানা বাইলি নামে এক ইংরেজ কবি তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি কবিতা উৎসর্গ করেছিলেন—

"For thirty years her reign of peace,
The land in blessing did increase;
And she was blessed by every tongue,
By stern and gentle, old and young.
Yea, even the children at their mothers feet
Are taught such homely rhyming to repeat
In latter days from Brahma came,
To rule our land, a noble Dame,
Kind was her heart and tright her frame,
And Ahlya was her honoured name."

অহল্যাবাই তাঁর কন্যার বিবাহ দেন এক সাধারণ মানুষের সঙ্গে। নাম যশবন্ত রাও। ডাকাতদের সঙ্গে তার লড়াইয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রানি এই সিদ্ধান্ত নেন। এতসবের পরেও অহল্যাবাইয়ের দুঃখ ঘোচে না। মারা যান তার জামাই যশবন্ত রাও। তখন তার কন্যা সহমরণে যান। তার চোখের সামনেই। এই ঘটনার পর তিনি একরকম মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। দুঃখ ভোলার জন্য তিনি তার পূজিত শিবলিঙ্গ সবসময় হাতে ধরে 'শিব শিব' জপ করে যেতে থাকলেন। আমৃত্যু সেই শিবলিঙ্গ তিনি কাছে রেখেছিলেন। ৭০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শাশুড়ির স্মৃতিমন্দিরের পাশে তাঁরই বানানো স্মৃতিমন্দিরে তাঁর অস্থি সমাহিত করা হয়। বর্তমান মহেশ্বর দুর্গের পাশে নর্মদা ঘাটে শাশুড়ি-বউমা দুজনের স্মৃতি মন্দির রয়েছে। ছোটো মন্দির দুটি কিন্তু গঠন এবং শিল্পভাবনায় অনন্য। 'শাশ-বহু মন্দির' নামে জনপ্রিয় হয়েছে এই দুটি মন্দির।

তিনি আদর্শ রানি ছিলেন। সারাজীবন ধরে তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন রানি হতে গেলে হতে হবে প্রজা নিবেদিত প্রাণ। রাজকোষের অর্থ প্রজাদের জন্য। ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য নয়। তাই তিনি সাদামাটা জীবনযাপন করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ সবই দূরে রেখে প্রজা সাধারণের ভালোর জন্য চিন্তা করে যেতে হবে। তাদের দিতে হবে ন্যায়বিচার। কতটা প্রজা হিতৈষী হলে পরে রানি তাঁর নিজের সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। ছোটো এক রাজ্য মাণ্ডুয়া। সামান্য এক রাজ্যের রানি হয়েও মাত্র ২৮ বছরের রাজত্বে, কীভাবে সারা ভারতের কল্যাণ করা যায় তিনি তার সদিচ্ছার মাধ্যমে, দেখিয়ে গিয়েছিছেন। কোথায় কেদারনাথ,কোথায় বদ্রীনাথ, কোথায় পুরী, কোথায় দ্বারকা, কোথায় রামেশ্বরম, কোথায় শ্রীশৈলম একসূত্রে গেঁথেছেন তিনি তার সদিচ্ছার দ্বারা। ভারত জুড়ে তিনি অসংখ্য রাস্তা-ঘাট, মন্দির, অতিথিশালা, যাত্রীশালা, যাত্রী সেবা সমিতি, চতুষ্পাঠি, পাঠশালা, কুয়ো, পুকুর, দুর্গ, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করলেও কখনো তিনি নিজের নামে ফলক কোথাও স্থাপন করেননি।

আজকের হিন্দু তীর্থযাত্রীর দল তাঁর অবদানের ব্যাপারে অবগত নন। আসলে তিনি আত্মপ্রচার পছন্দ করতেন না। তবে আত্মপ্রচার তিনি করুন আর না করুন ইতিহাসের দাবিকে অস্বীকার করতে কবে কে পেরেছে! তাইতো সময়ের হাত ধরে প্রকাশ হয়েই যায় মহানুভবদের মহান কীর্তি। লুকিয়ে থাকেনি এই মহান রানির মহান কীর্তি। সদিচ্ছা আর কল্যাণ ভাবনা যদি সঙ্গে থাকে, তাহলে স্বয়ং শিব ঠিক তার ভক্তদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন। হ্যাঁ পরীক্ষা নেবেন তিনি। বারেবারে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন তিনি। বিচারের তুলাদণ্ড হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি দেখবেন ক্ষমতা। একলা করে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন জীবনের রুক্ষ ভূমিতে। উত্তীর্ণ হলে তবেই দেবেন জীবনে আগে চলার শক্তি। সময়ের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হয়েছেন রানি অহল্যাবাই হোলকার... রানির জীবন সহজ ছিল না। কিন্তু মহান তো ছিল অবশ্যই।

এই মহান রানির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে ১৯৯৬ সালে। □

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর এক আন্তর্জাতিক মহামানব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক মহামানব। তিনি নিজেই বলেছেন, ' দেখ, সমস্ত নেশন আমাকে চায়। আমিও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে চাই। সব নেশনে আমি আছি। ইউরোপবাসী মিশনারিরা চার্চে আমার কাছেই প্রার্থনা করে শান্তি চায়।' জগদ্বন্ধু যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত নেশনে অণু-পরমাণুর মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে মহানাম সম্প্রদায়ের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল। আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। মহেন্দ্রজী মহানামব্রত ব্রহ্মচারীকে প্রতিনিধি করে সেই সম্মেলনে পাঠিয়েছিলেন।

প্রভু জগদ্বন্দু সুন্দরের জন্ম সীতানবমীতে, ২৮ এপ্রিল, ১৮৭১ সালে। বলা হয় তিনি এসেছিলেন কপালে রাজটিকা পরে, ১৯টি লক্ষণ নিয়ে। ললাটে চন্দ্রভাল, দেহে চন্দ্রসুধা। বৈশাখ মাসে বামাসুন্দরী দেবীর কোল আলো করে গঙ্গার তীরে ডাহাপাড়ায় এলেন এক তুলসী মহাজন। তিনি 'হরিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন, ' সুরধনী পারে রয়ে/ অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে/ ভাসিব রে নয়ন ধারায়।' তিনি নিজে শুধু ভাসেননি, ভাসিয়েও দিয়েছেন কৃষ্ণভক্ত মানুষকে। হরিনামে, কৃষ্ণনামে, নিতাই-গৌরাঙ্গ নামে ভাসিয়েছেন। বলা হয়, তিনি কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার সমষ্টি। বলেছেন, 'সকলকে নিষেধ করে দিস, যেন কেহ আমার জন্য নিতাই-অদ্বৈত প্রভৃতি না সাজে।' শুধু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু নন, তিন প্রধান সখীও গৌরসুন্দরে মিলিত রয়েছেন, এমনই বিশ্বাস ভক্তমণ্ডলীর। এ এক অভিনব তত্ত্ব। হরিকথা গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন, বাই - কুঞ্জ - ললিতিকা/শ্যামসুন্দর - বৃন্দিকা/মহাযোগ, বিরহ-প্রতাপে।' রসতত্ত্ব সখী বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ। সখীরা না থাকলে প্রেম আস্বাদনে অসামঞ্জস্য হয়। এবার গৌরসুন্দর তাই সখীভাবের অঙ্গীকার নিয়ে ধরাধামে এসেছেন, এমনটাই ভক্তবিশ্বাস। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর আপন লীলার মধ্যে তা কেবল দেখাননি, দেখিয়েছেন তাঁর বাণীসম্পুটের মধ্যেও।

মহানাম সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত প্রধান দেবতা হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই এবং প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। তিনি আটটি গ্রন্থ লিখেছেন যার মধ্যে আছে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অনুভূতি, তাঁর ঋদ্ধসত্য। তাঁর ছটি গ্রন্থ পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্গত। এরমধ্যে রয়েছে শ্রীমতী

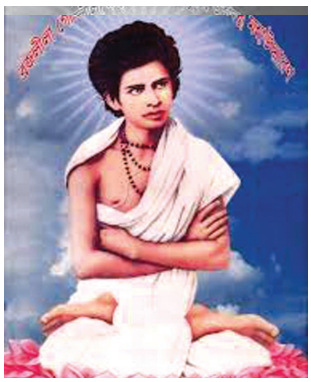

সংকীর্তন, শ্রীনাম কীর্তন, শ্রীবিবিধ সংকীর্তন। তিনটি মিলিয়ে 'সংকীর্তন পদামৃত'। বাকি তিনটি হলো শ্রীশ্রী সংকীর্তন পদাবলী, শ্রীশ্রীহরিকথা এবং শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত।

প্রভু জগদ্বন্ধু আবির্ভূত হয়েছেন জগতে মহানাম প্রচার করতে। মহানাম অঙ্গনে যার পরিভাষা হচ্ছে 'মহা অবতরণ' বা মহা উদ্ধারণ লীলা'। মহানামের মধ্যে আছে সৃষ্টিরক্ষার নিগূঢ় মন্ত্র। বলা হয় হরিনাম হলো 'বৈদ্য-বটিকা' রূপ। স্পিরিচুয়াল হসপিটালে পরিবেশিত বটিকা হলো হরিনাম। বন্ধুপ্রভু বলেছেন, আমি সুইপার, ঝাড়ু দিয়া পিউরিফাই করতে এসেছি। বলেছেন, হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই, প্রলয় এল প্রায়।'

মনে রাখতে হবে, তিনি নিম্নবর্গের হিন্দুদের প্রতি অপার প্রেম দিয়েছেন বলেই তিনি 'জগদ্বন্ধু'। (১) তিনি ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর, গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে 'মহা উদ্ধারণ' করেছেন। ফরিদপুরের উপকণ্ঠে ব্যাভিচারী বুনো বাগদিদের হরিনাম প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফলে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা রুখে গেল। নবজীবন পেল বুনো বাগদিরা। শুধু তাই নয়, বুনো বাগদিকে মোহন্ত করে তুললেন তিনি। মোড়লকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের দাস। মোড়লের নাম দিয়েছেন হরিদাস। একসঙ্গে গ্রহণ করেছেন রাধাগোবিন্দের প্রসাদ। ব্যাস, বিধর্মীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

উত্তর কলকাতার রামবাগান বস্তিতে বসবাসকারী ডোম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন আনলেন। একেই বলা যায় নাম-প্রেম দিয়ে পতিত উদ্ধার। 'হরিজন' সম্প্রদায়কে প্রেম দিলেন। কখন? তখনও গান্ধীজীর হরিজন রাজনীতির আবির্ভাব হয়নি। প্রভু জগদ্বন্ধু সেই সময়ই অন্ত্যেবাসী প্রান্তবাসী মানুষকে প্রকৃত হরিজন করে তুলেছেন।

প্রভুকে দেখা গেছে বারবানিতাকেও সাধিকা করে তুলতে। মানিকতলার বারাঙ্গনারা উদ্ধার পেলেন। সুরত কুমারী কৃপা পেলেন। প্রভু তাকে বৈরাগ্য দান করে রূপান্তর করে তুললেন 'সুরমাতা'।

তাঁর কাছে মানবজাতি একটিই জাতি। নরজাতি। নরজাতির দুটি ভাগ। প্রথম মহাজাতি যারা হরিভক্ত। দ্বিতীয়, অপজাতি, যারা ভক্তিহীন। তাদের কেন্দ্র করে 'মহানাম সম্প্রদায়' গঠিত হলো। হয়ে উঠল মহীরুহ। শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী সেই মহীরুহের কাণ্ড, নাম প্রচারণার দলপতি। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী, মহীরুহের লম্বমূল। এলেন শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাসজী, শ্রীমৎ জয়বন্ধুদাসজী, শ্রীমৎ কল্যাণবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ। শ্রীঅঙ্গন কীর্তনে, সুজনে, পাখির কূজনে পরিপূর্ণ হলো।

১৯১৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আমাদের স্থূলচক্ষে প্রভু তাঁর লীলা সংবরণ করলেন। কিন্তু ভগবদ্-দার্শনিকদের কাছে তাঁর এই অপ্রকট অবস্থা হলো 'মহা উদ্ধারণ লীলার সাময়িক দশা'। যেন মহাপ্রলয় থেকে জগৎ উদ্ধারের জন্য ভাবসমাধিতে থাকা। এক অনির্বচ তপস্যা। পুনরায় জেগে উঠবেন তিনি। তিনি নাম শুনছেন। তাই আমাদের হরিনাম সংকীর্তন চালিয়ে যেতে হবে। □

২০৪৭-এর লক্ষ্যে কোমর বাঁধছে ওরা

মণীন্দ্রনাথ সাহা

শিরোনাম দেখে অনেকেই হয়তো মনে করবেন, কীসের লক্ষ্য রে বাবা! বিজেপির অবলুপ্তির না ভারতের সমগ্র রাজ্য বিজেপির দখল নেওয়া, না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়া? না, এগুলোর কোনটাই নয়। যারা এবং যেজন্য ২০৪৭-কে লক্ষ্য রেখে আপনার আমার সবার সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তা হলো ২০৪৭ সালের মধ্যেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতকে ইসলামিক দেশে পরিণত করা। হ্যাঁ, কথাটা অপ্রিয় হলেও অত্যন্ত সত্যি কথা। দয়া করে আমার কথার সঙ্গে একটু মিলিয়ে দেখবেন।

মনে পড়ে আপনাদের সেদিনের কথা? যেদিন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ৮০ বছরের বেশি এক মুসলমান ভদ্রলোক মৃতপ্রায় অবস্থায় ভর্তি হওয়ার পর মারা যাওয়ায় ট্যাংরা থেকে লরিভর্তি প্রায় ২০০ বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ হাসপাতাল আক্রমণ করে এবং হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে অবস্থানকালে তাদের ওপর আক্রমণ হেনে কয়েকজনকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পরিণত করার কথা? মনে করে দেখুন সেই আক্রমকারীরা কেউ ধরাও পড়েনি বা কারও কোনো শাস্তিও হয়নি। পরবর্তীতে একের পর এক ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যেমন— এনআরসি বিরোধিতা আন্দোলন, শাহিনবাগ আন্দোলন, নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে তাতে এটাই প্রমাণ হচ্ছে ওরা অর্থাৎ '৪৭-এর স্বপ্নদেখা মাথারা সফল হয়েছে। এরা কোথায় সফল হচ্ছে? যে যে রাজ্যে বিজেপি বিরোধী সরকার আছে সেই সেই রাজ্যে। যেমন, কেরল এখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য এবং সেখানকার সরকারও ইসলামে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট সরকার। কংগ্রেস শাসনাধীন রাজস্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছে এক হিন্দু দর্জিকে। এমনকী হুমকি দেওয়া হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও।

কংগ্রেস যখন অসমে ক্ষমতায় ছিল তখন সেখানকার এআইইউডিএফ নেতা বদরুদ্দিন আজমলের বহু হুমকি আমরা শুনেছি। কিন্তু অসমের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর

সেই বদরুদ্দিন আজমল এখন বলছেন— 'আমরা এক সময় হিন্দু ছিলাম।'

একদা ভারতের হিন্দুত্ববাদী নেতা বাল ঠাকরের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁরই পুত্র উদ্ধব ঠাকরে শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে সম্পূর্ণ বিরোধী মতাদর্শের দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থনে ক্ষমতায় বসার পর সেখানকার '৪৭-এর লক্ষ্য রাখা বরপুত্ররা পালঘরে সন্ন্যাসী হত্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল— আমরা মহারাষ্ট্রে ভালো অবস্থাতেই আছি। কিন্তু উদ্ধবের কপাল মন্দ তাঁর দলের লোকেরা ইসলামি বরপুত্রদের বর্বরতার চেহারা অনুভব করে উদ্ধবকে ছেঁটে ফেলেছেন। মহারাষ্ট্রের বর্তমান সরকারের কাছে আমরা আশা রাখি পালঘর সাধু হত্যার সুবিচার হবে এবং মহারাষ্ট্র সন্ত্রাসমুক্ত হবে।

দিল্লির ঝাড়ুদার মুখ্যমন্ত্রীর আমলেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে শাহিনবাগ আন্দোলন করে ইসলামের বরপুত্ররা বুঝিয়ে দিয়েছে দিল্লিতে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। পঞ্জাবের লোকদের অনেক স্বপ্ন দেখিয়ে সে রাজ্যের লোকদের কংগ্রেসি শাসন থেকে মুক্ত করে ঝাড়ুদার সরকার সেখানে বহাল হয়েছে। সমগ্র পঞ্জাবকে যে কংগ্রেসদল পাকিস্তানের হাতে তুলে দিচ্ছিল সেই পঞ্জাবের কিয়দংশ পাকিস্তানের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ভারতে রেখেছিলেন বাঙ্গলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই পঞ্জাবের লোকেরা কিন্তু ভুলে গেছে শ্যামাপ্রসাদকে। ২০৪৭-এর লক্ষ্য রাখা ইসলামের বরপুত্রদের প্রতাপ সেখানে কেমনতর হয় তা সময়ই বলবে।

ফিরে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি। এনআরসি আন্দোলনে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে আক্রমণ, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর হিন্দুদের ওপর শাসকদলের অনুপ্রেরণায় ইসলামের বরপুত্ররা যেভাবে আক্রমণ হেনেছিল তা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষদের চমকে দিয়েছিল। সে আক্রমণ এতটাই বর্বরতার রূপ নিয়েছিল যা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরলের মধ্যে বিরলতম মনে হয়েছে। পরের ঘটনা নূপুর শর্মার মন্তব্য নিয়ে। এগুলো সবই চলছে প্রাক ২০৪৭-এর প্রস্তুতি পর্ব।

অথচ একই রকম আন্দোলনে উত্তরপ্রদেশের চিত্র আমরা ভিন্নরূপে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনকারীরা যে পোশাকে ট্রেন-বাস পুড়িয়েছে পুলিশের অনুপস্থিতিতে, সেই একই আন্দোলনে একই পোশাকের লোকেরা উত্তরপ্রদেশের পুলিশের লাঠির ভয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে পালিয়েছে।

ফঃ ৫

বিজেপি ও বিজেপি বিরোধীদের শাসনের তফাত এইখানেই।

তবে সবচাইতে হাড়হিম করা ঘটনা হলো— মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রড হাতে হাফিজুল মোল্লার প্রবেশ এবং সেখানে তার সাত-আট ঘণ্টা অবস্থান। সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের মনে রাখতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদ অনেকেরই আলাদা থাকতে পারে। তাঁর সমস্ত কাজকর্ম অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে। তবুও তিনি আমাদের সকলের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিত্ব এবং সম্মানের পাত্রী। তাঁর ওপর আঘাত মানে সমগ্র রাজ্যের ওপর আঘাত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানা যাচ্ছে— হাফিজুল মোল্লা যদি রড দিয়ে আঘাত মুখ্যমন্ত্রীকে মেরে ফেলতে পারত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হাফিজুলের পরিচালকরা রটিয়ে দিত এটা বিজেপির চক্রান্ত। আর তার ফলস্বরূপ সমগ্র রাজ্যজুড়ে শুরু হতো হিন্দুহত্যা। যেমনটা হয়েছিল ১৯৪৬-এ কলকাতা ও নোয়াখালিতে। কেউ তা রোধ করতে পারত না। কেননা হিন্দুরা নিরস্ত্র আর হাফিজুলরা পরিকল্পিত এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

হাফিজুল মোল্লাকে এখন পাগল সাজানোর চেষ্টা হচ্ছে। সিআইডি তদন্ত করে দেখুক হাফিজুলের শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আরও দেখুক মুখ্যমন্ত্রীর দলের মধ্যেই কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষীর পরোক্ষ প্রশ্রয় আছে কিনা। পাগলের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যদি কোনোভাবে একবার পশ্চিমবঙ্গের দখল নিতে পারে তবে এখানে কোনো হিন্দুর আর অস্তিত্ব থাকবে না। সে হিন্দু বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল যেই হোক না কেন। থাকবে শুধু ইসলামের বরপুত্ররা। ভাবুন, ভাববার অভ্যাস করুন। সময় কিন্তু খুবই সীমিত।

শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নয়। দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও হত্যা করার জন্য নাশকতার ছক কষেছিল বিহারের দুই জঙ্গি। ৪ জুলাই পাটনা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেছে বিহার পুলিশ। জানা গিয়েছে ১২ জুলাই বিহারের দেওঘরে বিমানবন্দরের উদ্‌বোধন করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই তাঁকে হত্যার ছক সাজানো হয়েছিল। আরও জানা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পনেরোদিন আগে তাঁকে হত্যা করার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে ধৃত দুই জঙ্গি। আর নিয়ম মতোই ধৃত জঙ্গি দুজনের নাম আতহার পারভেজ ও মহম্মদ জালালুদ্দিন। ফুলওয়ারি শরিফ এলাকায় তারা কিছুদিন প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। গত ৬ ও ৭ জুলাই মোদীর ওপর হামলার পরিকল্পনা করতে বিশেষ মিটিং করে দুজনে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফুলওয়াড়ি শরিফে তাদের ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে বহু নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেখানে জঙ্গি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই)-র অনেক বইও পাওয়া গিয়েছে। তাদের কাগজপত্রে জানা গিয়েছে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে ইসলামি দেশে পরিণত করার কথা। সেই সঙ্গে আরও জানা গিয়েছে, মাস দুই ধরেই দেশের নানাপ্রান্ত থেকে অচেনা লোকজন ফুলওয়াড়ি শরিফ এলাকায় যেত। নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলে থাকত তারা। মার্শাল আর্ট শেখানোর নামে তলোয়ার আর ছোরা চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ থেকে এই তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। পিএফআই সম্পর্কে গোয়েন্দা সংস্থা ও এনআইএ-র তদন্তে ধরা পড়েছে যে, এটি দেশের নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি অর্থাৎ স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার একটি মুখোশ।

তবে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং জেএমবি ও সিমির মতো সংগঠন অন্য রাজ্যে নিষিদ্ধ হলেও এখানে যে তারা ধর্মীয় উসকানি দিয়ে বহাল তবিয়তে দাঙ্গা লাগানোর ছক কষছে, এটা বেশ কয়েকবার প্রমাণিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে কেরল সরকার হাইকোর্টকে জানিয়েছিল যে, পিএফআই-এর কার্যকলাপ দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সংগঠনই ২০২০ সালে বেঙ্গালুরু দাঙ্গায় মদত জুগিয়েছিল। কেরলের কানপুরে এবিভিপি কর্মকর্তা শ্যামাপ্রসাদ খুনে এই সংগঠনকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

ঠিক এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বলা যায় সেনাবাহিনীর অগ্নিবীরদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে দেশে। যারা অগ্নিবীর প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন তারা প্রকৃতপক্ষে জেহাদিদের হাত শক্ত করছেন। অথচ এই প্রকল্প চালু হলে আগামী ২০ থেকে ৩০ বছর পর আমাদের দেশের গ্রামেগঞ্জে, শহরে, নগরের অলিতে গলিতে শত শত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ থাকবে। যারা বিদেশি শক্তি, অভ্যন্তরীণ শত্রু, দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী, দাঙ্গাবাহিনী, টুকরে টুকরে গ্যাং, ডাকাতদল ইত্যাদির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য অনেকটাই প্রস্তুত ও উপযুক্ত হয়ে উঠবে। কাজেই বিরোধীরা অগ্নিবীর সম্পর্কে যতই চেঁচামেচি করুক এ প্রকল্প কার্যকর করতেই হবে।

ভারতের তথা বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার লেবেল সাঁটা রাজনীতিক বা বুদ্ধিজীবী এবং ত্রিশূলকে অপমান করা, মা কালীকে মদ-সিগারেট খাওয়ানো ও বিএসএফ-কে ধর্ষক প্রতিপন্ন করা যিনি বা যাদের পিতা, পিতামহ তাঁদের অনেকেই কিন্তু নিজ জন্মভূমি, বিষয়-সম্পত্তি ফেলে শুধুমাত্র প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট এই পশ্চিমবঙ্গে। তাঁদের বর্তমান প্রজন্ম যেন মনে রাখেন, এখন কিন্তু এরাজ্যে শ্যামাপ্রসাদও নেই, নেই গোপাল পাঁঠাও। যিনি আছেন তিনি যেমন আপনাদের প্রিয়, তার চাইতেও বেশি প্রিয় এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। ভগবান না করুন, আপনারা যদি তাদের দ্বারা ধর্ষিতা হন, কিংবা কারও শিরচ্ছেদ করা হয় তখন হয়তো আপনাদের প্রিয় নেতৃত্ব বলে বসবেন— 'ধর্ষণ যেমন জীবনের অঙ্গ তেমনি শিরচ্ছেদও দোষের নয়।'

তখন পালাবেন কোথায়? অসম, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা কোথাও জায়গা পাবেন না। কারণ সেই সমস্ত রাজ্যের লোকেরা সীমান্ত এলাকায় লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। কাজেই সাধু সাবধান। এতদিন যাঁরা উদার চরিত্রের ধর্মনিরপেক্ষ সেজে আছেন, এবার তাঁরা পূর্বপুরুষদের কাছে শোনা দেশ ছাড়ার গল্প থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে অন্তত একজন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন। □

স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে ইসলামিক দেশ বানানোর ছক

গত ৭ জুলাই বিহারে গ্রেপ্তার হওয়া দুই জঙ্গির কাছ থেকে মারাত্মক নথি উদ্ধার হয়েছে, তাতে ২০৪৭ সালে ইসলামিক ভারত গড়ার এক ভিশন ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, কট্টরপন্থী ইসলামি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই) তাদের প্রশিক্ষিত সদস্যদের দিয়ে তুরস্কের মতো ইসলামিক দেশগুলোর সহায়তায় ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতকে ইসলামিক দেশ বানাবে।

বিহার প্রশাসনকে ধন্যবাদ যে তারা এই জঙ্গি সংগঠনটির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেই চুপ করে বসে থাকেনি, তারা ভিশন ডকুমেন্টে প্রকাশ করে পিএফআইয়ের দুরভিসন্ধি জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। এই ডকুমেন্ট যেসব মারাত্মক তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুত করে প্রশিক্ষণের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনই দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে প্রবেশ করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে পিএফআই সদস্যদের বসানো এবং আরএসএস কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত বিবরণ ও তাদের দপ্তরের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর রাখা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে।

অথচ এই জঙ্গি সংগঠনটি কয়েক মাস আগে আমাদের রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে শাসকদলের বদান্যতায় প্রকাশ্যে জাঁকজমক সহকারে তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে জঙ্গি ইসলামি সংগঠনগুলি বিগত কয়েক বছরে এরাজ্যে বেশ পাকাপাকিভাবেই জায়গা করে নিয়েছে। সিমির মতো নিষিদ্ধ সংগঠনে যুক্ত ব্যক্তিরা যখন রাজনৈতিক আশ্রয়ে সংসদ থেকে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করে তখন আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কয়ের বছর আগে খাগড়াগড় কাণ্ডে বাংলোদেশি জঙ্গি যোগ, ২০১৬ সালে ক্যানিঙের নলিয়াখালি, হাওড়ার ধুলাগড়ে হিন্দুদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ, বোমাবজি ও লুটপাট এবং মালদহের কালিয়াচকে জেহাদিদের দ্বারা পুলিশ থানা আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এরাজ্য কী পরিমাণ বারুদের

স্তূপের ওপর রয়েছে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল ছয় আলকায়দা জঙ্গি। কেরল থেকে মুর্শিদাবাদেরই আরও তিন আলকায়দা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। পশ্চিমবঙ্গকেই কেন বেছে নিচ্ছে জঙ্গিরা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে, শুধু প্রশ্নই নয়, বিতর্কও শুরু হয়েছে নানা মঞ্চে। সকলেরই মনে আছে, বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের ওপর রয়েছে। রাজ্যে মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর।' ভোটরাজনীতির স্বার্থে সেদিন বামফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী চরম সত্য স্বীকার করলেও কোনো ব্যবস্থা নেননি। বরং পার্টির চাপে পড়ে নিজের কথা অস্বীকার করে বলেছিলেন তাঁর কথার নাকি ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তখন থেকেই জেহাদি শক্তির বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়।

বর্তমান তৃণমূল সরকারের ছত্রছায়ায় গত ১১ বছর ধরে সেই জেহাদি কার্যকলাপ বেড়েছে বহুগুণ। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে জনসংখ্যায় ভারসাম্যহীনতায় জেহাদিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে এই রাজ্য। ভোটব্যাংকের লোভে বর্তমান শাসকদলও তাদের সমর্থন করে চলেছে।

বামেদের কাছে সম্প্রদায় ভেদে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা পালটে যায়। জেএনইউ-এর কানহাইয়া কুমার এবং যাদবপুর ইউনির্ভাসিটির দেবাঞ্জন ও তাদের মদতদাতা –– এরা সবাই কমিউনিজমের আড়ালে ইসলামিক জেহাদকেই পুষ্ট করে চলেছে। কমিউনিজম যে মানসিক বিকৃতিরই আর এক নাম, কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপের সমর্থনে এদের বক্তব্যেই তা ধরা পড়ে। ইসলামিক জিহাদকে এরা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নাম দিয়ে আসল সত্য ও তথ্যকে আড়াল করতে চায়।

বামেদের নেতা বুরহান ওয়ানি নিজের বক্তব্য রেকর্ড করে প্রচার করেছিল শুধু কাশ্মীর নয়, সারা বিশ্বে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করা হবে এবং ইসলামিক খিলাফত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং ভারতকে ইসলামিক দেশ বানানোর পরিকল্পনা তাদের বহুদিন আগে থেকেই চলছে। বামেরা আগাগোড়া এদের সঙ্গে রয়েছে। এখন রাজ্যের বর্তমান শাসকদলও এদের পুষ্ট করছে। বিহারে দুই জঙ্গি ধরা পড়ায় তা সবার নজরে এসেছে। □

অভিনয় মিশেছে আধুনিক গান ও বাউলাঙ্গে

রূপশ্রী দত্ত

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২২— ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২) ছিলেন বিখ্যাত গায়ক, সংগীতকার ও সংগীত নির্দেশক। হাওড়া জেলার বালি বারেন্দ্রপাড়ায় তিনি অতি রক্ষণশীল এক শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মা অন্নপূর্ণা দেবী। তাঁর মা-ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। গোকুল নাগ, পণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল তাঁর গুরু ছিলেন।

প্রথমে ধনঞ্জয় আধুনিক বাংলা ও হিন্দি গান দিয়ে আরম্ভ করেন। ১৯৪০ সালে প্রণব রায়ের কথা ও সুবল দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছিলেন, 'যদি ভুলে যাও মোরে, জানাব না অভিমান।' পাইয়োনিয়ার রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত গানটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল।

নেপথ্যগায়ক হিসেবে 'শহর থেকে দূরে' ছবির গান— 'ও রাধে, ভুল করে তুই চিনলিনাকো প্রেমিক শ্যামরায়'-ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে তাঁর দেওয়া গানের সুর ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গীতিকারও ছিলেন। গীতিকার হিসেবে তিনি 'শ্রীপার্থ' ও 'শ্রী আনন্দ' ছদ্মনাম নিয়ে ছিলেন।

সংগীত পরিচালক হিসেবে 'জয় মা-তারা', 'লেডিজ সিট', 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ', 'ঢুলি (১৯৫৪)', মহাপ্রস্থানের পথে (১৯৫২)' ছবিতে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। 'রানি রাসমণি' ও 'সাহেব বিবি গোলাম'ও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর অভিনেতা সত্তাও সমান জনপ্রিয় ছিল। অভিনেতা হিসেবে হাস্যরসাত্মক ছবিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'পাশের বাড়ি', 'শ্বশুরবাড়ি' ছবিতে তিনি অভিনেতা হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। 'শ্বশুরবাড়ি' ছবিতে দুই যমজ বোনের দুই স্বামী হিসেবে অভিনয় করেছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। যমজ বোন হিসেবে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ও ভালো অভিনয় করেছেন।

পূর্ণদাসকে বাউল সম্রাট বলা হয়। জন্ম ১৮ মার্চ, ১৯৩৩। তিনি ১৪০টি দেশভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের এক গ্রামে জন্মেছেন। তাঁর পিতার নাম নবীন দাস বাউল। তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দাস বাউলও ভালো বাউলশিল্পী ছিলেন।

বিদেশি সংস্কৃতিশিল্পী মিক জ্যাগার ও বব ডিলান পূর্ণদাসকে 'বাউল অব আমেরিকা' আখ্যা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁকে 'বাউল সম্রাট' আখ্যা দেন। ১৯৯৯ সালে দশম রাষ্ট্রপতি কে.আর নারায়ণনের কাছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া পাঞ্জাবি ও হাতে একতারা-সহ পূর্ণদাস বাউল কয়েকটি মঞ্চ-নাটকেও গান-সহ অভিনয় করেছেন। □

সদাই ফকিরের পাঠশালায় মানুষ গড়েন সুজিত মাস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বয়স আশি ছুঁইছুঁই। তবুও প্রতিদিন সকাল-বিকেল নিয়ম করে প্রায় ৪০০ পড়ুয়াকে পড়াতে বসেন সুজিত মাস্টার। তার জন্য দক্ষিণা নেন মাত্র ২ টাকা। বর্ধমানের আউশগ্রামের অশীতিপর মাস্টারমশাই সুজিত চট্টোপাধ্যায়ের কোচিং ক্লাসে উপচে পড়ে ভিড়। তবুও তাঁর ক্লান্তি নেই। শখ করে নিজেই তাঁর পাঠশালার নাম দিয়েছেন 'সদাই ফকিরের পাঠশালা'।

হাওড়া থেকে বর্ধমানের ট্রেনে বলগোনা হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় আউশগ্রামে। সদাই ফকিরের পাঠশালায় পড়াশোনা করতে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে পড়ুয়ারা। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই জনজাতি সম্প্রদায়ের। ৮০ শতাংশই আবার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। প্রিয় মাস্টারমশাই সুজিতবাবুর কাছে পড়ার জন্য প্রতিদিন কুড়ি কিলোমিটার যাতায়াত করতেও প্রস্তুত ছাত্রছাত্রীরা। পড়ুয়াদের এই আগ্রহ দেখে বিস্মিত হন সুজিতবাবু।

ভোর ৬টা থেকে শুরু হয়ে যায় সদাই ফকিরের পাঠশালা। কখনো শীতের হাড়হিম করা সকালে সূর্য ওঠার আগেই শুরু হয় ক্লাস। চলে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত। অনেকেই বলেন, উচ্চমানের স্কুলগুলি থেকে কোনও অংশেই কম না এই পাঠশালা। প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামো মেনেই এখানে পড়ানো হয়। অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার থেকে শিক্ষক-অভিভাবক মিটিং সবকিছুই নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়।

আউশগ্রামের প্রত্যন্ত গ্রাম উত্তর রামনগর। বাংলায় স্নাতকোত্তর সুজিত চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৫ সালে এই গ্রামেরই উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। শিক্ষক জীবনে স্কুল ছুটির পর দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাস নিতেন তিনি। একই সঙ্গে জনজাতি শিশুদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগেও শামিল হয়েছিলেন। একসময় অবসর নিলেন।

তারপরই একদল পড়ুয়া এসে পড়ানোর আবদার করে। সেদিনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ''দিন চারেক হয়েছে, সবে স্কুল থেকে অবসর নিয়েছি। কয়েকটা ছেলেমেয়ে এসে বলল, 'স্যার আপনি আমাদের আর পড়াবেন না? তাহলে আমরা কোথায় যাব?'' ওদের কথাতেই আবার পড়ানো শুরু করলাম।

শুধু পড়ানো নয়। নানারকম সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন সুজিত মাস্টারমশাই। উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্কুল, কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে একাধিকবার সুপারিশ করেছেন। তাঁর কাছে ক্লাস করতে দূরদূরান্ত থেকে বহু ছাত্রী প্রতিদিন ২০-২৫ কিলোমিটার পাড়ি দেয়। অনেক ছাত্র সাইকেলে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার পথ ভেঙে সুজিতবাবুর কাছে পড়তে আসে। এই পথে একটা বাসরুটের জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি। যদিও সেসব এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীকালে একটি বাণিজ্যিক পত্রিকা তাঁর শিক্ষাদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য তাঁর পাশে দাঁড়ায়। দেশের একজন আদর্শবান নাগরিক হিসেবে বহু সংস্থা সম্মান জানিয়েছে সুজিতবাবুকে। রবিবারের সকালেও তাঁর পাঠশালায় পড়ুয়াদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন 'সদাই ফকির'। পড়ান মাধ্যমিক স্তরের আর্টস সাবজেক্ট। বাংলা হোক বা ভূগোল, যেকোনও বিষয় পড়ানোর সময় তাঁর মূল লক্ষ্য থাকে পড়ুয়ারা যেন বাইরের পৃথিবী সম্পর্কেও জানতে পারে।

অনন্য শিক্ষাপ্রণালীর জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের মন জয় করে নিয়েছেন সুজিতবাবু। তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র পীযুষকান্তি ঘোষ বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক। তিনি জানিয়েছেন, ''সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারটিকে বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন মাস্টারমশাই। সামাজিক দায়বদ্ধতা কী, তা ওনার কাছেই শিখেছি। আমাদের নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন উনি।'' তাই সুজিতবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত পড়ুয়ারা সামর্থ্যমতো থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত দুঃস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ব্রত নিয়েছে।

সমাজের প্রতি বিশেষ অবদানের জন্য শিক্ষাব্রতী সুজিত চট্টোপাধ্যায়কে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করেছে ভারত সরকার। জীবন চলে পেনশনের টাকায়। পড়িয়ে যা পান তাও খরচ করে দেন ছেলেমেয়েদের বইখাতা কিনতে। লক্ষ্য তাঁর একটাই, ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। বলেন, ''কিছু নিয়ে আসিনি। কিছু নিয়েও যাব না। যখন দেখি আমার ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আরও পাঁচজনকে পথ দেখাচ্ছে, তখন আমি গর্ববোধ করি।''

সৎসঙ্গ

বহুকাল আগে মহারাজ পাঞ্চাল ছিলেন পাঞ্চাল নগরের রাজা। এই সময় বোধিসত্ত্ব শুকপাখি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুকপাখিরূপী বোধিসত্ত্ব বাস করতেন একটি নদীর তীরে পাহাড়ের কোলে একটি শিমুলগাছে। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে তার ছোটো ভাইও থাকত।

পাহাড়ের একধারের গ্রামে চোরেদের বাস ছিল, অন্যধারে বাস করতেন সাধু সন্ন্যাসীরা। একদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। ঝড়ে শিমুলগাছ থেকে ছিটকে গিয়ে বোধিসত্ত্ব পড়লেন সাধু সন্ন্যাসীদের গ্রামে আর তাঁর ভাই গিয়ে পড়ল চোরেদের গ্রামে। দুই ভাই আলাদা হয়ে গেলেন। বহুদিন তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই।

পাঞ্চালরাজ মহারাজ একদিন শিকারে বেরিয়েছেন সঙ্গীসাথী লোক লশকর নিয়ে। একটি হরিণের পিছু নিয়ে ছুটতে ছুটতে গভীর বনে প্রবেশ করলেন মহারাজ। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি নেমে এল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মহারাজা একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়লেন। বুঝতে পারেননি যে তিনি চোরেদের গ্রামে পৌঁছে গিয়েছেন।

বহু অলংকারে ভূষিত রাজাকে দেখে সেই গাছের ওপর থেকে একটি শুকপাখি অন্য চোরেদের ডেকে বলল, রাজার গায়ে দামি দামি অলংকার। রাজা ঘুমিয়ে পড়েছে, এখনই সব খুলে নিতে হবে। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রাজা সব শুনে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের অন্য পাশের গ্রামে এসে পৌঁছলেন। রাজাকে ছুটতে দেখে বোধিসত্ত্ব রূপী শুক বললেন,

মহারাজা, নমস্কার। দাঁড়ান। আপনি বড়ো ক্লান্ত। বিশ্রাম গ্রহণ করুন। গ্রামের সবাই নদীতে স্নানে গেছেন। আপনি গাছের ফল খেয়ে ও নদীর জল পান করে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করুন।

রাজামশাই ফল ও জল পান করে সুস্থ হয়ে ভাবতে শুরু করলেন, আগের পাখিটি চোরেদের সাহায্য করছে আর এই পাখিটি কী অতিথি পরায়ণ, কী সুন্দর সাধু সন্তের মতো।

রাজা কিছুক্ষণ শান্তভাবে বসার পর বোধিসত্ত্ব রূপী শুক বললেন, আপনি ওভাবে ছুটছিলেন কেন? রাজা তখন চোরেদের গ্রামের শুকপাখিটির কথা বিস্তারিত ভাবে বললেন।

সব শুনে বোধিসত্ত্বরূপী শুক বললেন, মহারাজ, ওই পাখিটি আমার ভাই। ছোটোবেলায় ঝড়ে ছিটকে গিয়ে ও চোরেদের গ্রামে পড়েছে। ওখানেই বড়ো হয়েছে। তারফলে ও চোরেদের স্বভাব পেয়েছে। আর আমি এই সাধু সন্ন্যাসীদের গ্রামে এসে পড়েছি। ওদের মধ্যে থাকতে থাকতে আমি ওদের মতো হয়ে গেছি। আসলে মহারাজ, যে যে পরিবেশে বড়ো হয়, সে সেখানকার আচরণই শিখে ফেলে।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

রামকৃষ্ণ রায়

বিপ্লবী রামকৃষ্ণ রায় ১৯১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার চিরিমাতসাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কেনারাম রায়। তিনি বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর তিনি মেদিনীপুরের জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ধরা পড়ে হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মেদিনীপুর জেলে ২৫ অক্টোবর তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- ভারতে মোট ৮৩৩৮টি রেলস্টেশন আছে।
- সবচেয়ে বড়ো নামের রেলস্টেশন – বেঙ্কটনরসিমহারাজুভারিপেটা (Venkatanarasimharajuvaripeta)। ইংরেজি ২৮টি অক্ষর। অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত।
- সবচেয়ে ছোটো নামের স্টেশন ওড়িশার 'আইবি'। ইংরেজি ২টি অক্ষর Ib।
- ভারতীয় রেলের মোট দৈর্ঘ্য ৯৫ হাজার ৯৮১ কিমি।।
- ভারতীয় রেল এশিয়ার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম রেলওয়ে নেটওয়ার্ক।

ভালো কথা

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ

প্লাস্টিকের সিঙ্গল ইউজ ক্যারিব্যাগ কেন্দ্র সরকার নিষিদ্ধ করায় আমি খুব আনন্দিত। আমি বহুদিন থেকেই ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করি না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ যে তিনি ১ জুলাই থেকে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি দু'বার ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি দু'বারই তাঁর 'মন কী বাত'-এ তা উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর ৮০টি দেশে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিষিদ্ধ। আফ্রিকা মহাদেশের ৩০ টি দেশে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ১৯৯৮ সাল থেকে ভারতেরই এক রাজ্য সিকিমে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দেরিতে হলেও আমাদের সারা দেশেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করল সরকার। নবাঙ্কুরের বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, আমরাও কেউ আর প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করবো না।

রূপম মাহারা, দ্বাদশ শ্রেণী, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

অনাসৃষ্টি

কুশল সামন্ত, নবম শ্রেণী, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা এসে
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি
তবু কিন্তু ভ্যাপসা গরম
একি অনাসৃষ্টি।
বৃষ্টি হলে ঠাণ্ডা হয়
এটাই তো ঠিক কথা
এখন তবে বৃষ্টি হলে
গরম কেন ভ্যাপসা?

দিদুন বলে হবে না কেন
গাছপালা যে শেষ,
এমনি করে চলতে থাকলে
থাকবে না কিছুর রেশ।
দাদাই বলে একটি উপায়
লাগাতে হবে গাছ
তবেই, বৃষ্টি হলে ঠাণ্ডা হবে
প্রাণ ভরে নেবো শ্বাস।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

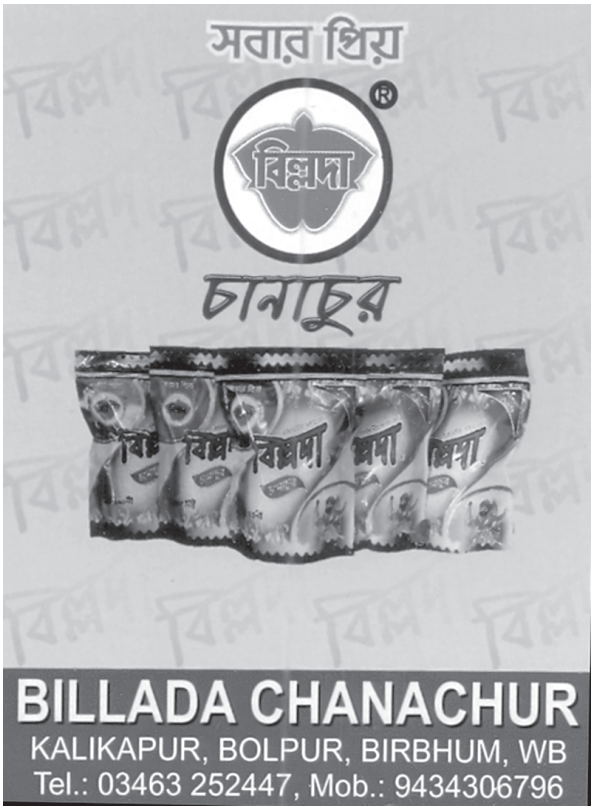

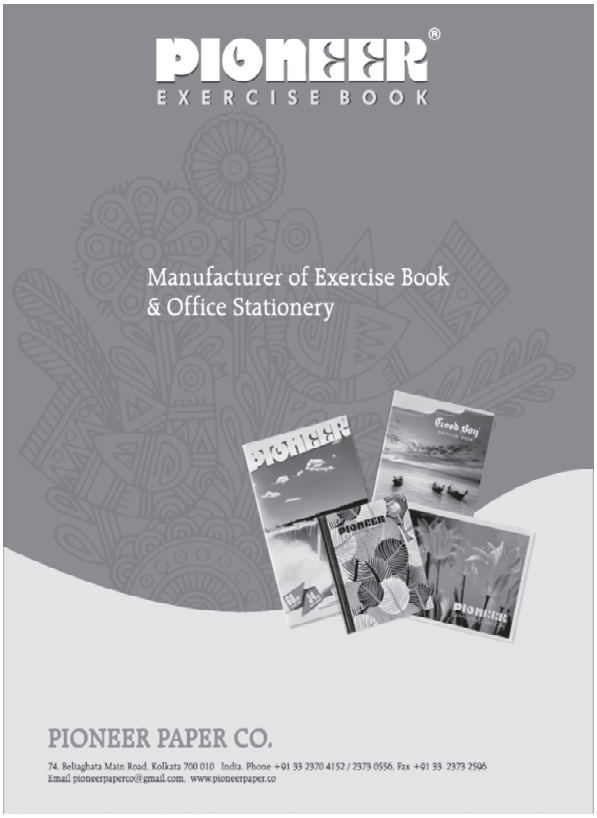

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাংলাদেশে ইসলামি সন্ত্রাস চলছেই

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

সম্প্রতি এক ফেসবুক পোস্টে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার ভুয়ো অভিযোগে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার সাহাপাড়ার দিঘলিয়া বাজার এলাকায় মুসলমানরা হিন্দুদের মন্দির, দোকান এবং বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর করে।

ওই সন্ধ্যায় মুসলমান দুষ্কৃতীরা কয়েকটা বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়ে একটাতে আগুন ধরিয়ে দিলে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ সতর্কতামূলক গুলি চালায়। বাংলাদেশ নিউজ অনলাইন পত্রিকা স্থানীয় থানার একজন পরিদর্শক হারান চন্দ্র পালকে উদ্ধৃত করে বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে হামলাকারীরা গ্রামের একটি মন্দিরে ইট ছুড়ে মারে। মন্দিরের ভেতরের আসবাবপত্রও ভাঙচুর করে তারা। ডেইলি স্টার পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি দোকানও ভাঙচুর করা হয়েছে।

হারান চন্দ্র পাল আরও বলেন, আকাশ সাহা নামে এক যুবক ফেসবুকে আপত্তিকর কিছু পোস্ট করেছেন, যা মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এইরকম গল্প আমরা শুনতেই থাকব। খোঁজাখুঁজি করেও যুবকের সন্ধান না পাওয়ায় পুলিশ তার বাবাকে থানায় নিয়ে যায়। জুম্মার নামাজের পর পোস্টটি নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিকেলে একদল মুসলমান তাদের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ করে। পরে তারা বাড়িঘরে হামলা চালায়। তখনও কোনো হামলাকারী গ্রেপ্তার হয়নি। রাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বলে জানান পুলিশ পরিদর্শক, কিন্তু আতঙ্কের ঘোর কাটেনি, কাটার কথাও নয়।

ডেইলি স্টার পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, নড়াইলের পুলিশ সুপার প্রবীর কুমার রায় জানান, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে। আমরা ঘটনার তদন্ত করছি। হিংস্র ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান রায়।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম জানিয়েছে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বাড়ছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলো গুজব বা ভুয়ো পোস্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে হামলা ঘটানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের নড়াইল জেলায় মুসলমান জনতা ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর দুই দিন পর, হিন্দু ভুক্তভোগীরা রাতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করেছেন। জুম্মার নামাজের পরে, উগ্রবাদীরা হিন্দুদের সম্পত্তিতে হামলা চালায়। তারা কয়েক ডজন হিন্দু দোকান ছাড়াও তিনটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তথাকথিত 'ব্লাসফেমি'র অজুহাতে সাহাপাড়া গ্রামে বসবাসকারী ১০৮টি হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওনা হয় দুষ্কৃতি দল।

নৃশংস হামলার শিকারদের মধ্যে একজন ছিলেন ৬২ বছর বয়সি দীপালি সাহা, যাঁর চোখের সামনে ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দীপালি বাধ্য হয়ে বাড়ির পাশের একটি শেডের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। তার সঙ্গে তার ছেলে পান ব্যবসায়ী গোবিন্দ ছিলেন। জেহাদি জনতার নজর এড়াতে দুজনেই একটি বিছানার খাটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে ছিলেন।

তালাবন্ধ থাকায় তারা ঘরটি ভাঙতে পারেনি। তারপর তারা পাশের মন্দিরে হামলা করে এবং মূর্তি ভাঙচুর করে'। বৃদ্ধা দেখিয়েছেন কীভাবে তাঁর নাতনি রাই সাহার জিনিসপত্র ছাই হয়ে গেছে। এক দল আমাদের সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করার পর, অন্য দল এসে আমাদের দরজা খোলা দেখতে পায়। লুট করার মতো কিছুই অবশিষ্ট না থাকায় তারা আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সভাপতি ৬৫ বছর বয়সি শিবনাথ সাহাকে উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি বলেছে, 'গ্রামে পুলিশ পাহারায় রয়েছে, কিন্তু আমরা তাদের বিশ্বাস করতে পারি না।'

তিনি জোর দিয়েছিলেন, সাহাপাড়া গ্রামের সঙ্গে দীপালি সাহার কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও, জেহাদি জনতা তার বাড়িকে ছাড়েনি। 'শুধু ছাত্রটি হিন্দু এবং আমিও হিন্দু বলেই আমার বাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে'।

দিপালি সাহা বলেন, 'আমি জানি না কতদিন এই সহিংসতার হুমকি আমাদের তাড়িত করবে। কে দেবে আমাদের বিচার? আমাদের নিরাপত্তা কে দেবে? আগুন দেওয়ার সময় যদি আমি ঘরে থাকতাম তবে আমি মারা যেতাম। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু এটা কি বেঁচে থাকা বলে? এখন শুধু আমার পরনের শাড়িটি ছাড়া আর কিছুই নেই।' নড়াইল জেলা প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও দীপালি আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

হামলার সময় তার পুত্রবধূ চন্দ্রা সাহা সাহাপাড়া গ্রামে ছিলেন না। বাড়ি ফিরে চন্দ্রা তার পরিবারের মর্মান্তিক পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন। তিনি দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'আমি এখানে আমার সন্তানদের নিয়ে থাকতে চাই না। আমি শিকার হতে চাই না।'

গোপাল সাহা নামে একজন সার ব্যবসায়ী বর্ণনা করেছেন কীভাবে তিনি নির্দয়ভাবে জেহাদিদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। তিনি জানান, তিনি ২২ বছর

ফঃ ৬

ধরে দিঘলিয়া বাজারে ব্যবসা করছেন। 'আমাকে মারধর করার তাদের একমাত্র কারণ হলো আমি হিন্দু। ভুয়ো অভিযুক্ত ছেলের বাড়িও আমার থেকে অনেক দূরে। তাতে কী দোষ আমার? একজন হিন্দু হিসেবে আমি এই গ্রামে আর নিরাপদ বোধ করছি না'।

দিঘলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য বিউটি রানি জানান, জেহাদিদের আক্রমণের পর বিপুল সংখ্যক হিন্দু সাহাপাড়া গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। 'প্রায় সব বাড়িই তালাবন্ধ। বাড়িতে শুধু কিছু পরিবারের বড়রা রয়েছেন। তারাও ভীত'।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'যখন আমাদের ওপর হামলা হচ্ছিল, তখন পুলিশ ছিল। তারা দূর থেকে দেখছিল এবং কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসেনি। পুলিশকে আর বিশ্বাস করা যায় না এবং এ কারণেই মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

দ্য ডেইলি স্টারের সংবাদদাতা দীপঙ্কর রায় গ্রামে গেলে তিনি একটি ছোটো কুঁড়েঘরে মাত্র দু'জন বৃদ্ধকে দেখতে পান। জানা গেছে, তাদের একজন শিবনাথ সাহা (৬৫) নামে সাহাপাড়া গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সভাপতি।

তিনি বলেন, শুক্রবার অশোককে আটকের পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সবাইকে বলেন যে তারা অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করছেন এবং হিন্দুরা নিরাপদ থাকবে। তা সত্ত্বেও আমাদের ওপর হামলা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়েছিল'।

দিঘলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আজগর আলি জানান সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাগুলিকে ২৬০০০ টাকা (২২,১২৪ ভারতীয় টাকা) প্রদান এবং তাদের ঘর পুনর্নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছে।

আইন ও সালিশি কেন্দ্রের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ৩,৬৭৯টি হামলা চালানো হয়েছে।

ডাচ রাজনীতিবিদ গিয়ার্ট উইল্ডার্স টুইট করে বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা আবার মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত। পৃথিবী কেন চুপ করে আছে? কেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে ইসলামি হিংস্রতা চলছে? এটা হতে পারে না। ভারতে নয়, বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর কোথাও নয়'।

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবরের ভোরে ইকবাল হোসেন নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার নানুয়ার দীঘির পার দুর্গা মন্দিরে প্রবেশ করে এবং হনুমানের মূর্তির পায়ে কোরানের একটি অনুলিপি রাখে। তার ফল হিসেবে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে একের পর এক সহিংস হামলার সূত্রপাত ঘটে।

হিন্দুরা জোরের সঙ্গে বলেছিল যে তাদের মধ্যে কেউই পূজা প্যান্ডেলে কুরান রাখেনি এবং ঘটনাটি হিন্দুদের উপর আক্রমণ করার একটি সুপরিকল্পিত যোজনা ছিল। পাঁচ দিনেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা চলেছে। হিন্দুদের উপর হামলার অন্যান্য ভিডিয়োর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভগ্ন মূর্তি, ভাঙা প্যান্ডেল এবং মা দুর্গার মূর্তি এক পুকুরে ফেলে দেবার ভিডিয়ো প্রকাশ পেয়েছে।

কুমিল্লার পুলিশ সুপার (এসপি) ফারুক আহমেদ জানান, পূজাস্থলের ভিডিয়ো ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ ইকবালকে শনাক্ত করেছে। অক্টোবরের ২১ তারিখ রাত ১১টার দিকে কক্সবাজার থানা পুলিশ অভিযুক্ত ইকবাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) জাকির হোসেন খান ডেইলি স্টারকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে অধিকতর তদন্তের জন্য হোসেনকে কুমিল্লা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করার পরে, এটিও পাওয়া গেছে যে অভিযুক্তরা সকালে লোকেদের সহিংসতায় উসকানি দিয়েছিল এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়েছিল। ধর্মান্ধদের দ্বারা ভাঙচুর ছাড়াও ওই দাঙ্গায় চারজন হিন্দু নিহত এবং আরও অনেকে আহত হওয়ার পরে সরকারকে ২২টি জেলায় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছিল।

দুনিয়া জুড়ে হিন্দুদের বদনাম করার জন্য বড়োসড়ো ষড়যন্ত্র চলছে আর সেই লক্ষ্যে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার রটগার্স ইউনিভার্সিটির গবেষণার একটি রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং মেসেজিং সার্ভিস-এর মাধ্যমে হিন্দু বিরোধী প্রচার ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে বেশ কিছু বছর ধরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভব্য ভাষার ব্যবহার বেড়েছে। অথচ সেই দিকে কেউ নজর দেয়নি। সম্প্রতি এই কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

ইনফর্মেশন অব সোশ্যাল মিডিয়ার গবেষণা অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য ইসলামিক নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রকাশ্যেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে।

রটগার্স ইউনিভার্সিটির গবেষকরা নিজেদের গবেষণায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার জন্য কেস স্টাডি করছিলেন। সেখান থেকেই তারা জানতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দুবিরোধী সমস্ত টুইট শুধুমাত্র পাকিস্তান থেকেই আসে না, দেখা গেছে ইরান-সহ অন্যান্য দেশের বেশ কিছু সরকারি তথ্য দপ্তর থেকেও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যেগুলি সমস্তই হিন্দু বিরোধী। কমপক্ষে ১০ লক্ষ টুইট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ভারতে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ভুয়ো তথ্য দিয়ে প্রচার চালানো হয়েছে এবং হিন্দু বিরোধী প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিউজার্সির গভর্নর এসটিএম স্কলার্স প্রোগ্রামের হাই স্কুলের ছাত্রদের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে এইসব জানা গেছে। এরা সকলেই নিজেদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে সাইবারক্রাইম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক-এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জানতে মেশিন লার্নিঙের চেষ্টা করছিল। তখনই তারা হিন্দু বিরোধী ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার এইসব তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

ভারতে নূপুর শর্মার বক্তব্যকে সামনে রেখে হিন্দুবিরোধিতা ছড়ানো রেকর্ড হারে বেড়েছে জুলাই মাসে। এসবের মাধ্যমে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। □

বসুন্ধরাকে এখনই না বাঁচালে অনেক দেরি হয়ে যাবে

অরবিন্দ ব্যানার্জি

এই বসুন্ধরাই যদি না বাঁচে, মানব সভ্যতা কীভাবে বাঁচবে? প্রবল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, প্রকৃতি ধ্বংস, সমুদ্রের জল স্তর বৃদ্ধি, ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক, জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক হিংসা বৃদ্ধি, ধনী-দরিদ্র বিপুল বৈষম্য ও শোষণ, যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, অতিমারি— সব মিলিয়ে পৃথিবী এখন বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

১৮০০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৯৮ কোটি, ২০২০-তে ৭৮০ কোটি। ১৮০০ সালে বায়ুমণ্ডলে সমষ্টিগত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৮০ পিপিএমভি (পার্টস পার মিলিয়ন ইন ভলুম), শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানা বৃদ্ধি পাওয়ায় যা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। আর তারপর থেকে তা বাড়তে বাড়তে ২০২০-তে এসে পৌঁছেছে ৪১৫ পিপিএমভি-তে। ১৮০০ সালে পৃথিবীর ভূতলের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ২০২০-তে তা ১.১ ডিগ্রি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা কিনা যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষের সীমাহীন দুর্গতির কারণ।

মোদ্দা কথা আরও অনেক কিছুর মধ্যে বসুন্ধরাকে বাঁচাতে প্রধানত তিনটে কাজ করতে হবে : (১) জনসংখ্যা কমাতে হবে। প্রাথমিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ (population stabilization) করতে হবে। (২) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও কমাতে হবে। (৩) পৃথিবীর তাপমাত্রা কমাতে হবে।

আমাদের মধ্যে একটি চিন্তা থাকে আগে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে ক্ষমতা দখল হোক তারপর এসব হবে (বিপ্লব হলে সব হয়ে যাবে)। এটি ভুল চিন্তা। একসঙ্গেই করতে হবে। নইলে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে এবং আরও হবে তাতে আর ফেরার পথ থাকবে না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যাক : ১৯৭১-এ শ্রীলঙ্কায় বাম ট্রটস্কিপন্থী ও জাতীয়তাবাদী জনতা ভিমুক্তি পেরুমনা (জেভিপি)-র নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়, কিন্তু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন সফল হয়। পরের বছরে বাংলাদেশে বামপন্থী জাসদ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। শ্রীলঙ্কা তারপর পঞ্চাশ বছরে দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা, ১৯৮৭-৮৯ জেভিপি-র পুনরায় বিদ্রোহ আর ১৯৮৩ থেকে ২০০৯ অবধি এলটিটিই-এর সঙ্গে ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের মধ্যেও পরিবেশ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকগুলোয় যথেষ্ট উন্নতি করে। বাংলাদেশ প্রথম তিন দশক চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক ও মৌলবাদী অভ্যুত্থান, দারিদ্র্য, জনবিস্ফোরণ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তারপর অনেক উন্নতি করেছে। টোটাল ফার্টিলিটি রেট (টিএফআর) দুই-এর নীচে নিয়ে গেছে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে।

ভারতে স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৭১-৭৫ দেশ জুড়ে সফল আন্দোলন হয়, পরবর্তী সরকারগুলি কিছু পদক্ষেপ নেয়। এগুলো চলতেই থাকবে কিন্তু শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশের মতো সার্বিক উদ্যোগের অভাবে আমাদের দেশে কিছু রাজ্য বাদ দিয়ে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলি সেভাবে কার্যকর হয়নি। ধরুন, ভারতে কমিউনিস্ট দল তৈরি হয়েছে ১০০ বছরেরও আগে। তারা এখনও বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করে উঠতে পারেননি। তাদের একটি অংশ নির্বাচনে জিতে পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় দীর্ঘ সরকার চালিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তাদের আমলে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। তাহলে বিপ্লব না হওয়া অবধি অর্থাৎ এই ১০০ বছর এবং আরও যতদিন তারা ক্ষমতায় আসতে না পারবেন বসুন্ধরার ক্ষয়ক্ষতি চলতে থাকবে, এটি কখনও হতে পারে না।

এবার আসি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথায়। দক্ষিণ কোরিয়া (টিএফআর ০.৯), পুয়ার্ত রিকো (১.০), সিঙ্গাপুর (১.১), হংকং (চায়না এএসআর) (১.১), মালটা (১.১), ইউক্রেন (১.২), স্পেন (১.২)-সহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, পূর্ব ইউরোপীয় ও বলকান দেশগুলি খুব ভালো ফল করেছে। চীন (১.৭) ও ভারতও (২.১) প্রজনন হার অনেক কমিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাব-সাহারান দেশগুলো-সহ কিছু মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়ার পিছিয়ে পড়া দেশ। এদের মধ্যে বেশিরভাগই খুব গরিব, যুদ্ধ বিধ্বস্ত, আইনশৃঙ্খলা কিছু নেই। আবার কয়েকটি দেশ খনিজ তেলের বলে বলীয়ান ও খুব ধনী এবং সেখানে কঠোর ধর্মীয় আইন বলবত।

নাইজার (৬.৮), সোমালিয়া (৬.০), মালি (৫.৮), চাদ (৫.৬), নাইজেরিয়া (৫.৩), সাউথ সুদান (৪.৭), আফগানিস্তান (৪.৫), মাওরিটানিয়া (৪.২), ইথিওপিয়া (৩.৯), আর্টিরিয়া (৩.৮), ইয়েমেন (৩.৮), তাজিকিস্তান (৩.৬), পাকিস্তান (৩.৫), ইরাক (৩.৫) কিরগিজস্থান (৩.৩), ইজিপ্ট (৩.৩), কাজাখস্তান (২.৮), তুর্কমেনিস্তান (২.৮), ওমান (২.৮), সিরিয়া (২.৭), জর্ডান (২.৬), উজবেকিস্তান (২.৪), সৌদি আরব (২.৩), ইন্দোনেশিয়া (২.৩) প্রভৃতি দেশ জনবিস্ফোরক অবস্থায় আছে। এর মধ্যে বুরুন্ডি, দক্ষিণ সুদান ও ইথিওপিয়া বাদ দিলে সবগুলোই ইসলামিক দেশ। তার মধ্যে বেশিরভাগই সুন্নি হানাফি বা সালাফি প্রধান। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাব, পশ্চাদপদতা, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় মৌলবাদের নিশ্চিত সম্পর্ক আছে।

ইসলামিক দেশগুলির মধ্যে যাদের অর্থনীতি, শিক্ষা উন্নয়ন ও আধুনিকতার হার ভালো তারা জনসংখ্যা অনেক কমিয়ে এনেছে। সংযুক্ত আমিরশাহী (১.৪), আজারবাইজান (১.৭), মালদ্বীপ (১.৮), কাতার (১.৯), মালয়েশিয়া (১.৯), বাহরিন (১.৯), তুরস্ক (২.০), বাংলাদেশ (২.০)। আলজেরিয়া (২.৩), মরক্কো (২.৩), লিবিয়া (২.২), টিউনিসিয়া (২.১), ইরান (২.১) প্রভৃতি দেশ মাঝামাঝি জায়গায় আছে।

আবার দেশ, রাজ্য, অঞ্চলগত তারতম্য আছে। যেমন ভারতের বিহার (২.৯৮), ঝাড়খণ্ড (২.৫), উত্তপ্রদেশ (২.৩৫), রাজস্থান (২.২), মধ্যপ্রদেশ (২.১) অনেক পিছিয়ে আছে।

এবার কার্বন ও গ্রিনহাউস গ্যাস (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি) নিঃসরণ এবং উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিতে আসি। ১৯৭২-এর স্টকহোম সম্মেলন থেকে ২০২১-এর গ্লাসগো সম্মেলন অবধি ভালো ভালো আলোচনা হলেও কাজ বিশেষ এগোয়নি। বিপরীতে সবচাইতে বেশি দূষণ ছড়িয়ে এসেছে ও ছড়াচ্ছে জি ২০ আরও নির্দিষ্টভাবে জি ৭ শিল্পোন্নত দেশগুলি। ২০০০ সাল অবধি সবচাইতে বেশি দূষণ ছড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারপর থেকে সবচাইতে বেশি চীন। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও ভারত। আন্তর্জাতিক চাপ এবং দেশের জনমতের চাপ দিয়ে এই ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলিকে বাধ্য করতে হবে কার্বন নিঃসরণ কমাতে। লোভ, অপচয় ও অতিরিক্ত ভোগের দর্শনের বিপরীতে প্রকৃতি ও পরিবেশক বাঁচিয়ে মিলেমিশে ভাগ করে অনাড়ম্বরভাবে শান্তিতে থাকার দর্শন, সংস্কৃতি ও অনুশীলন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমগ্র মানব সমাজে।

(১) প্রয়োজনে অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হবে। (২) প্রতিটি শিল্পে বায়ু, তরল ও কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করে সংস্থাপন করতে হবে। (৩) প্রতিটি নগর ও মানব বসতির সমস্ত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করে সংস্থাপন করতে হবে। (৪) প্লাস্টিকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৫) জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো ন্যূনতম করতে হবে। বিমান ভ্রমণ খুব জরুরি কারণেই করা যাবে। বৈদ্যুতিক ও পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত ট্রেন, বাস, গাড়ি, জলযান, গণ পরিবহণের উপর জোর দিতে হবে। সর্বত্র সাইকেল যাত্রার উপর জোর দিতে হবে। (৬) জোর দিতে হবে অপ্রচলিত শক্তি বিশেষ করে সৌর শক্তি উৎপাদনের উপর। (৭) বন সংরক্ষণ ও বন সৃজন করে ৩০ শতাংশ জমি গাছ দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে। (৮) মৃত নদী ও জলাভূমিগুলিকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে। (৯) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি পাঠ শিক্ষা দিতে হবে। (১০) বৃষ্টির মিষ্টি জল ধরে রেখে পানীয় জল, জলসেচের কাজে লাগাতে হবে ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (১১) ভূস্তরের মহার্ঘ্য জল নিঃশেষ করে চাষ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। (১২) উপকূল অঞ্চল ধরে প্রচুর পরিমাণে ম্যানগ্রোভ ও ভারিটার ঘাস পুতে ভূমিক্ষয় ও সাইক্লোনের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (১৩) আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা চালিয়ে সমস্ত পারমাণবিক, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি সরকারকে যেমন এগুলি বলবৎ করার সৎ চেষ্টা দেখাতে হবে, তেমনই বিরোধী দল, নাগরিক ও বেসরকারি সংগঠন, সংবাদমাধ্যম, আদালত, প্রশাসন ও প্রতিটি ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে এগুলি অবশ্যই অর্জন করা সম্ভব। পাশাপাশি প্রয়োজন উপযুক্ত আইন, তার প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় ও বোঝাপড়া। এভাবেই আমরা বসুন্ধরা ও মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব।

□

বিপুল ঋণের বোঝা কমাতে রাজ্যকে পরামর্শ কেন্দ্রের

বিশেষ সংবাদদাতা ॥ ঘাড়ে চেপে থাকা ঋণের প্রকৃত অঙ্ক কতটা, তা জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গকে আরও তিন বছর সময় দিল কেন্দ্র। মাথায় বাড়তে থাকা ঋণের বোঝা নিয়ে এমনিতেই অস্বস্তিতে আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। এই পরিস্থিতিতে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে খুব দ্রুত ঋণের বোঝা কমানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের ঋণের বহর দেখে একই পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। এ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রকের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের ঋণের বোঝা তদের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (স্টেট জিডিপি বা এসজিডিপি) ৩৪.২ শতাংশ। তার ওপরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, কৃষকবন্ধু, রূপশ্রীর মতো একগুচ্ছ প্রকল্পে বিপুল বরাদ্দের দরুন রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ আয়ের ২৫ শতাংশই খরচ হয়ে যাচ্ছে।’’ এই পরিস্থিতিতে সতর্ক না হলে, ২০২৬-২৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের ঋণের ভার রাজ্যের জিডিপির ৩৭ শতাংশে পৌঁছে যাবে বলে সাবধান করেছে রিজার্ভ ব্যাংকই।

তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, যে সমস্ত রাজ্য এখনও কেন্দ্রকে আগের ঋণের টাকা শোধ করতে পারেনি উপরন্তু প্রতি অর্থবর্ষে আরও ঋণ নিয়ে চলেছে সেইসব রাজ্যকেও তিন বছরের সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রকে তাদের বকেয়া টাকার পরিমাণ জানাতে হবে এবং দ্রুত তা মেটানোর পরিকল্পনা করতে হবে। প্রসঙ্গত, ঘাড়ে চেপে থাকা ঋণের বোঝা কমিয়ে দেখাতে অনেক রাজ্যই বাজেটের বাইরে ঋণ নিচ্ছে। গত মাসে ধর্মশালায় মুখ্যসচিবদের বৈঠকে কেন্দ্রের তরফে এ বিষয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, কোভিডের জন্য রাজস্ব আদায় কমেছে সব রাজ্যেরই। বেড়েছে খরচ। যে কারণে আরও বেশি করে ঋণ নিতে হয়েছে রাজ্যগুলিকে। অর্থমন্ত্রক সূত্রে খবর, রিজার্ভ ব্যাংক সম্প্রতি রাজ্যগুলির রাজকোষের পরিস্থিতি যাচাই করে কোন রাজ্য কতখানি বিপজ্জনক জায়গায় আছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেই অনুযায়ী যে ১০টি রাজ্যের জিডিপির অনুপাতে ঋণের হার সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দশটির মধ্যে আবার পাঁচ রাজ্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। উল্লেখযোগ্যভাবে সেই তালিকাতেও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যকে তার মধ্যেই ঋণের একটা বড়ো অংশ পরিশোধ করতে হবে।

রাজ্যের রাজকোষ (সম্ভাব্য ঋণ)

সাল	রাজ্যের জিডিপির অনুপাতে
২০২১-২২	৩৪.৪ শতাংশ
২০২২-২৩	৩৪.২ শতাংশ
২০২৬-২৭	৩৭.০ শতাংশ

রাজস্ব খরচ

ঋণের সুদ	২০.৮ শতাংশ
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারসহ নগদ বিলির প্রকল্পে	০৯.৫ শতাংশ
পেনশন, পুরনো ঋণের সুদ ও প্রশাসনিক খরচ	৩৫ শতাংশ

পঞ্চদশ অর্থকমিশনের তরফে রাজ্যগুলির ঋণের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০২০-২১ সালে সেই উর্দ্ধসীমা টপকে ঋণ নেয় পশ্চিমবঙ্গ। অনুমান করা হচ্ছে চলতি অর্থবছরে পশ্চিমবঙ্গের ঋণ আর রাজকোষের ঘাটতি দুই-ই অর্থ কমিশনের লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি হবে। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু, কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর মতো চারটি বিলি প্রকল্পকে চিহ্নিত করেছে রিজার্ভ ব্যাংক। তাদের মতে, রাজ্যের মোট রাজস্ব আয়ের ৯.৫ শতাংশই এসব নগদ বিলি বা ভর্তুকিতে খরচ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের এক কর্তা বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট খরচের ৯০ শতাংশের বেশি অর্থ বেতন, পেনশন, নগদ বিলি ও ঋণের সুদ মেটাতে খরচ হয়। ফলে নতুন পরিকাঠামো তৈরিতে খরচের জন্য অর্থ বাড়ন্ত হয়ে যায়। রাজস্ব খাতে খরচের মধ্যেও আবার ৩৫ শতাংশের বেশি পেনশন, পুরনো ঋণের সুদ ও প্রশাসনিক খরচে ব্যয় হয়। এইসব খরচ কমানোর উপায় নেই। ফলে উন্নয়ন খাতে খরচের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকছে না। পরিস্থিতি শোধরাতে কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ ছাড়া উপায় নেই’’। সেই সূত্রে, ধর্মশালার বৈঠকে অর্থমন্ত্রকের কর্তারা রাজ্যগুলোকে নিত্য-নতুন খয়রাতি প্রকল্প নিয়ে সতর্ক করেছেন।

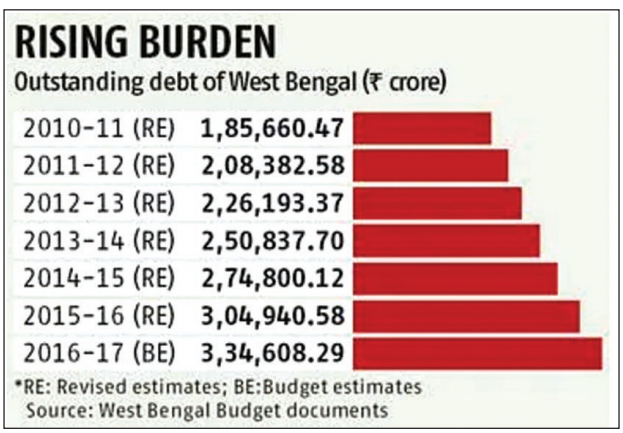

দিল্লিতে ভারতের নতুন বাণিজ্য ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের ২৩ জুন বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের 'বাণিজ্য ভবন'-এর নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেন। ইন্ডিয়া গেটের কাছে নির্মিত বাণিজ্য ভবনটি

একটি স্মার্ট বিল্ডিং হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এটি একটি সমন্বিত এবং আধুনিক অফিস কমপ্লেক্স হিসেবে কাজ করবে যা মন্ত্রকের অধীনে থাকা বাণিজ্য বিভাগ এবং শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রচার বিভাগ দ্বারা ব্যবহৃত হবে। ২২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৩৩ একর জমির উপর ভবনটি নির্মিত হয়েছে। ছয় তলার এই ভবনে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের এক হাজারেরও বেশি কর্মী একসঙ্গে বসে কাজ করতে পারবেন। এর ফলে যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, তেমনই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার দ্রুত সমাধান করে ব্যবসার গতি আরও ত্বরান্বিত হবে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২২ জুন নতুন বাণিজ্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

'এক দেশ এক রেশনকার্ড'এ যোগদানকারী শেষ রাজ্য অসম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্মসূত্রে অনেক মানুষকেই অন্য রাজ্যে গিয়ে থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েন রেশন নিয়ে। এতদিন রেশন তোলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট ডিলার ছাড়া রেশন নিতে পারতেন না। ফলে যারা ভিন রাজ্যে থাকতেন তারা সমস্যায় পড়তেন। সেই সমস্যার সুরাহা করতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৯ সালের আগস্টে চালু হওয়া কেন্দ্র সরকারের এই অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী প্রকল্প 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' এখন সারা দেশেই বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে ভিন্‌রাজ্যে

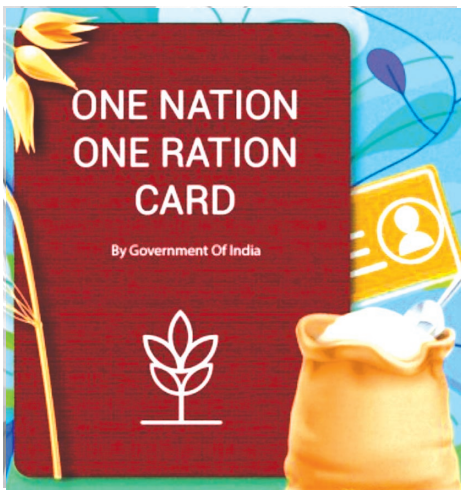

থেকেও উপভোক্তা স্থানীয় ডিলারের থেকে রেশন নিতে পারবেন। ২১ জুন এই প্রকল্পে শেষ রাজ্য হিসেবে যোগ দিয়েছে অসম। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের সর্বাধিক সুবিধা পাওয়ার জন্য 'মেরা রেশন' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। ভারত সরকারের অ্যাপটি সুবিধাভোগীদের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করছে। বর্তমানে ১৩টি ভাষায় অ্যাপটি পাওয়া যাচ্ছে।

'নির্যাত' বাণিজ্য পোর্টালের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে গতি আনতে 'নির্যাত' নামে একটি নতুন পোর্টাল চালু করল ভারত সরকার। এবার থেকে বাণিজ্যের বার্ষিক বিশ্লেষণের জন্য জাতীয় আমদানি-রপ্তানির যাবতীয় রেকর্ড পাওয়া যাবে এই পোর্টালে। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এক জায়গায় পাওয়ার জন্য এই পোর্টালটি ডিজাইন করেছেন ভারতের প্রযুক্তিবিদরা। এর মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত সকল ভারতীয় সংস্থাকে এক মঞ্চে নিয়ে আসতে সুবিধা হবে।

সারা বিশ্বের মানচিত্র, পণ্য মানচিত্র এবং ভৌগোলিক মানচিত্র থেকে তথ্য বিশ্লেষণের সুবিধা প্রদান করবে নির্যাত। ফলে এই প্রথমবার সহজেই রাজ্যগুলি থেকে বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানির গতি প্রকৃতি সময়মতো বিশ্লেষণ করা যাবে এবং রাজ্যগুলিতে রপ্তানি হাব তৈরির পাশাপাশি তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। গত ২৩ জুন দিল্লিতে নবনির্মিত বাণিজ্য ভবনের উদ্বোধনের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্যাত বাণিজ্য পোর্টালের উদ্বোধন করেন। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, এই পোর্টালটি ভারতের উচ্চাভিলাষী রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করবে। ফলস্বরূপ ভারত তার শক্তিশালী রপ্তানি সম্ভাবনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞ মহলের।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৯

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

উপন্যাস

প্রবাল - বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ● **এষা দে** - একটি কাল্পনিক কাহিনি
সুমিত্রা ঘোষ- স্বপ্ন ধরার জন্য

জীবনী

বিজয় আঢ্য

পুরাণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - বাঁধন

গল্প

শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তাস্য যশ, নিখিল চিত্রকর, সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রবন্ধ

রঙ্গাহরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর আচার্য, সুজিত রায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুজিত ঘোষ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৯।।

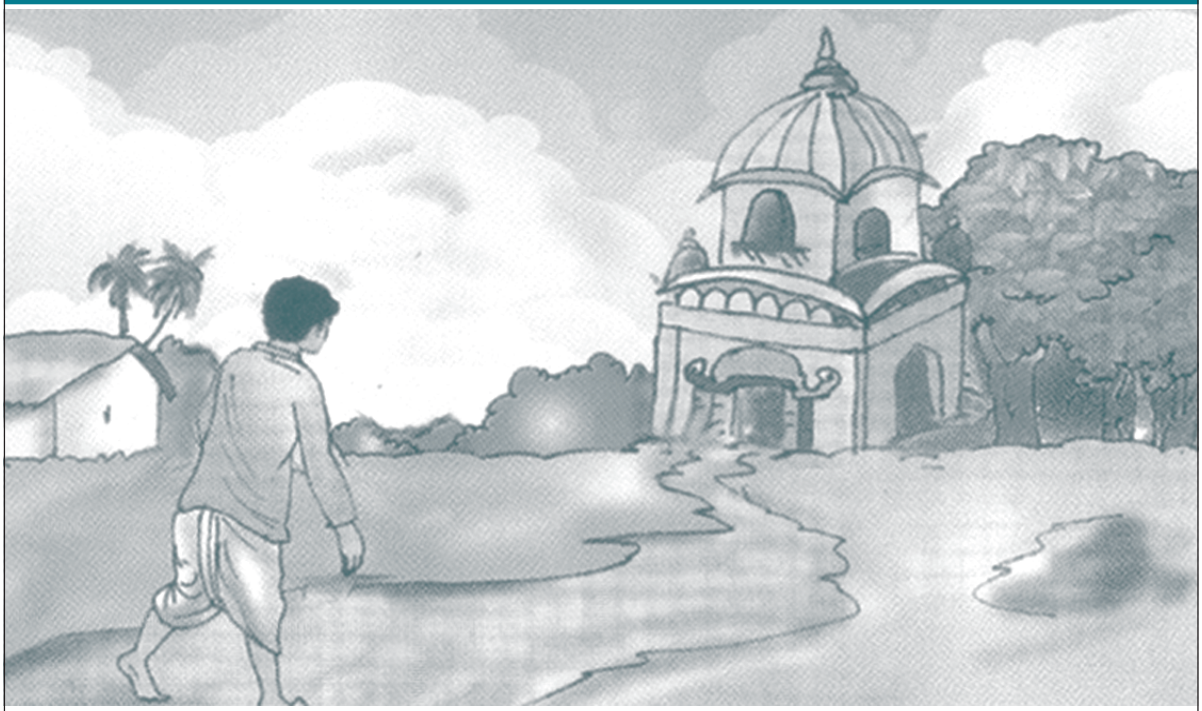

এই সময় থেকে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। মনে জাগল গরীবের প্রতি দয়া আর ধর্মের প্রতি অনুরাগ। পাশের গ্রাম ভারুকাটিতে ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম।

সেখানে বঙ্কিম নিয়মিত যেতেন। কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গী করে গৃহস্থ বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে সব তিনি বিলিয়ে দিলেন নিঃসম্বল গরীবদের মধ্যে। *(ক্রমশ)*